নভেম্বর ২০১৭ ■ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৪

সচিত্র বাংলাদেশ

জেল হত্যা : জাতিকে মেধাশূন্য করার ঘৃণ্য প্রয়াস

বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সিপিএ

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ নিন

৭ মার্চের ভাষণ : ইউনেস্কোর স্বীকৃতি বিশাল গৌরবের

বিদায় প্রকৃতিপ্রেমিক দ্বিজেন শর্মা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও এসডিজি

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

নভেম্বর ২০১৭ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ৫ নভেম্বর ২০১৭ গণভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি বিষয়ক পররাষ্ট্র সচিব টমাস এ শ্যানন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন –পিআইডি

সম্পাদকীয়

৩ নভেম্বর। মানবতা ও গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত দিন। স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে ধ্বংস এবং যুদ্ধ অপরাধীদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়। এর কিছুদিন পর ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কর্তৃক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা এবং বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা যেন একই সুতোয় বাঁধা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধু যখন কারাগারে বন্দি, তখন তাঁর বিশাল শূন্যতা পূরণে জাতীয় এই চার নেতা মূল ভূমিকা রেখেছিলেন। এই দিনটি সামনে রেখে তাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি। নভেম্বর ২০১৭ সংখ্যাটিতে এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঋতুবৈচিত্র্যে আবর্তিত বাংলার প্রকৃতি। হেমন্ত নানা দিক নিয়ে বাংলার এক অনন্য ঋতু। এ ঋতুতে প্রকৃতি হয়ে ওঠে কুয়াশাচ্ছন্ন। সকালে ঘাসের শিশিরে রোদ পড়ে ঝিলমিল করে। মাঠে মাঠে পাকা ধানের শিষে কৃষকের স্বপ্ন দোল খায়। আবেগঘন হেমন্তের প্রকৃতি নিয়ে থাকছে নিবন্ধ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং টেকসই উন্নয়ন বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ঘটানো, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধিতে শিল্পকারখানার অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সংখ্যাটিতে রয়েছে নিবন্ধ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর তেজোদৃপ্ত ভাষণ গোটা বাংলার মুক্তিকামী মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়েছিল। এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ এবারের সংখ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

এছাড়া নিয়মিত বিভাগ, গল্প, কবিতা নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* নভেম্বর সংখ্যাটি। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর; **স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।**

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সিপিএ
রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ নিন ৪
শাহনাজ আক্তার রেহানা

জাতিকে মেধাশূন্য করার ঘৃণ্য প্রয়াস ৬
খালেক বিন জয়েনউদদীন

জাতীয় চার নেতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ৮
ফারুক নওয়াজ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং টেকসই উন্নয়ন ৯
সাদিয়া সুলতানা

৭ই মার্চের ভাষণ
ইউনেস্কোর স্বীকৃতি বিশাল গৌরবের ১১
সৈয়দ শাহরিয়ার

জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা
গণমাধ্যমের এক নতুন যাত্রা ১৩
মাহবুব রেজা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ১৬
এফ রহমান রূপক

দ্বিজেন শর্মা বলতেন, 'মানুষ, বৃক্ষের মতো আনত হও, হও সবুজ...' ১৯
রোকেয়া আক্তার

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রফেসর ড. মীজানুর রহমানের কিছু কথা ২১
এম এ খালেক

হেমন্ত: বাংলার অনন্য ঋতু ২৫
সুলতানা বেগম

ঋতুকন্যা হেমন্ত : সেকাল-একাল ২৭
বরুণ দাস

ব্লু হোয়েল শুধু নয়, যে-কোনো আসক্তিই ক্ষতিকর ৩০
মো. সালাহউদ্দীন

হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্পের ভুবন বাঙালি মধ্যবিত্তের দর্পণ ৩১
রেবেকা শারা

খুলনা-কলকাতা 'বন্ধন এক্সপ্রেস' ট্রেন চালু ৩৩
রেহানা শাহনাজ

জলবায়ু তহবিল ও প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ৩৫
নাজমা ইসলাম

অশ্রুজল আর সৎমা ৩৭
জিয়াউদ্দিন সাইমুম

হাইলাইটস

৩ নভেম্বর : অভিশপ্ত কালরাত ৩৮
শাফিকুর রাহী

লালনের দেশে ঠাকুরের ঘরে ৩৯
হুমায়ুন মুজিব

গল্প

সোনার লখিন্দর ৪১
ফজলে আহমেদ

কবিতাগুচ্ছ ৪৩-৪৫
নাসির আহমেদ, বাবুল তালুকদার, অর্ণব আশিক, জাকির আবু জাফর, শাহরিয়ার নূরী, জাকির হোসেন চৌধুরী, সোহরাব আহম্মেদ, নাহার আহাম্মেদ, নির্মল চক্রবর্তী, বোরহান মাসুদ, সাদিয়া সুলতানা, হাসানাত লোকমান, মাইন উদ্দিন আহমেদ

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৬
প্রধানমন্ত্রী ৪৬
তথ্যমন্ত্রী ৪৭
জাতীয় ঘটনা ৪৮
আমাদের স্বাধীনতা ৪৯
উন্নয়ন ৫০
আন্তর্জাতিক ৫০
শিক্ষা ৫১
প্রতিবন্ধী ৫২
শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ ৫৩
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫৩
স্বাস্থ্যকথা ৫৩
যোগাযোগ ৫৪
সংস্কৃতি ৫৫
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৬
কৃষি ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৭
জেন্ডার ও নারী ৫৮
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৫৯
নিরাপদ সড়ক ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬০
সামাজিক নিরাপত্তা ৬১
শিল্প-বাণিজ্য ৬২
মাদক প্রতিরোধ ৬৩
চলচ্চিত্র ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

জেল হত্যা

জাতিকে মেধাশূন্য করার ঘৃণ্য প্রয়াস

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে প্রাণ হারাতে হয় এবং তিন মাসের মাথায় প্রাণ হারাতে হয় তাঁর সহযোগী-সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে। তাঁদের প্রাণ হারাতে হয় বাংলার আরেক মীরজাফর খোনকার মোশতাক, চাকরিচ্যুত একদল মেজর এবং মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী ও পাক সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্রের কারণে। কাজেই বাংলাদেশের ইতিহাসে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ ঘটনার নাটের গুরু খুনি মোশতাক। এ নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৬।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং টেকসই উন্নয়ন

বাংলাদেশে যুগান্তকারী শিল্পকারখানা গড়ে উঠছে। দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। দেশীয় প্রযুক্তির ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বদলে গেছে দৃশ্যপট। বাংলাদেশে উৎপাদিত যন্ত্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি যন্ত্রাংশ এখন চীন-ভারতের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশ্ববাজারে স্থান করে নিচ্ছে। কিছুদিন আগেও এদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি যন্ত্রাংশের জন্য বাংলাদেশ শতভাগ আমদানিনির্ভর ছিল, আজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এ নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-৯।

৭ মার্চের ভাষণ

ইউনেস্কোর স্বীকৃতি বিশাল গৌরবের

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন ও বিজয়ের পথ ধরে এগোয় বাঙালি গণমুক্তিসংগ্রামের এক যৌক্তিক পরিণতির দিকে।

বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণার অপরাধে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে প্রথমে কেন্দ্রীয় কারাগারে পরে কুর্মিটোলায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি রাখে। এ নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-১১।

হেমন্ত: বাংলার এক অনন্য ঋতু

বাংলার এক অনন্য ঋতু হেমন্ত। কৃষকের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণালি ধান উপহার দেয় এ ঋতু। এসময় কৃষকের মুখে থাকে অনাবিল জীবন-জাগানিয়া হাসি। কিষানির মুখে নতুন স্বপ্নের আহ্বান। সারা বছরের ধান গোলায় উঠানোর আনন্দে উৎসাহিত কিষানিরা। অভাব-অনটনে থাকা কৃষকের ঘরে বয় আনন্দের বন্যা। সারা বছরের স্বপ্ন এ সময় বাস্তবে রূপ নেয়। বেঁচে থাকার নতুন স্বপ্ন দেখায়। এ নিয়ে বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা-২৫।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি সিপিএ

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জরুরি পদক্ষেপ নিন

শাহনাজ আক্তার রেহানা

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর সম্মেলনে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিশ্ব সম্প্রদায়কে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের ৬৩তম সম্মেলন ৫ই নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিপিএ'র ভাইস প্যাট্রন হিসেবে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। সম্মেলনের সব সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে।

সিপিএ'র চেয়ারপারসন ও জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী জানান, এবারের সম্মেলনে সিপিএ'র নির্ধারিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি স্পেশাল কম্পোনেন্ট (বিশেষ উপাদান) হিসেবে রোহিঙ্গা ইস্যু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, সংসদ সদস্য, অন্যান্য প্রতিনিধিসহ সাড়ে পাঁচশর মতো, প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেন। এর মধ্যে ৫৬ জন স্পিকার ও ২৩ জন ডেপুটি স্পিকার অংশ নেন। ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, বাংলাদেশের জন্য এই সম্মেলন খুবই আনন্দ ও গৌরবের। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথে যোগ দেয়। কমনওয়েলথের অধিকাংশ সদস্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দেয়। ১৯৭৩ সালে কানাডার অটোয়ায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে প্রথমবারের মতো যোগ দেয় বাংলাদেশ। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেসময় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটিশ আইল্যান্ড, কানাডা, ক্যারিবিয়ান আমেরিকান ও আটলান্টিক, ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া –এই নয়টি অঞ্চল নিয়ে সিপিএ গঠিত। বিশ্বের ২৪০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করা কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন গণতন্ত্রকে সুসংহত করা, আইনের শাসন ও মানবাধিকার রক্ষা করা এবং জনগণের ক্ষমতায়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে কাজ করে।

বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাময়িকভাবে আমরা এই বিপুলসংখ্যক

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৭ নভেম্বর ২০১৭ বঙ্গভবনে ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্সে আগত অতিথিবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সিপিএ'র চেয়ারপারসন ও জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী ৫ নভেম্বর ২০১৭ সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ৬৩তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্স (CPC)-এর উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন –পিআইডি

গণভবনে ৭ নভেম্বর ২০১৭ কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সিপিএ'র চেয়ারপারসন শিরীন শারমিন চৌধুরী –পিআইডি

রোহিঙ্গা নাগরিককে আশ্রয় দিয়েছি। সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের অনুরোধ জানান রোহিঙ্গা ইস্যুটি গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে। মিয়ানমার যেন তার নাগরিকদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করে এবং বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মর্যাদার সঙ্গে ফিরিয়ে নেয়।

সিপিসি সদস্যদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের ওপর এ বিষয়ে চাপ প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর মিয়ানমারের অমানবিক নির্যাতন এবং তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা শুধু এ অঞ্চলে নয়, এর বাইরেও অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। কমনওয়েলথভুক্ত ৫২টি দেশের মধ্যে ৪৪টি দেশ এই সম্মেলনে অংশ নেয়।

এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য– 'কনটিনিউয়িং টু এনহান্স দ্য হাই স্ট্যান্ডার্ডস অব পারফরমেন্স অব পার্লামেন্টারিয়ানস'। রোহিঙ্গা সংকটের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মিয়ানমার সরকারের নির্মম আচরণের ফলে ২৫ আগস্ট থেকে ৬ লাখ ২২ হাজারের বেশি রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। ১৯৭৮ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে আসা আরো প্রায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছে। মানবিক কারণে তাদের বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে। তাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ বরাবরই বলে আসছে রোহিঙ্গা সমস্যার পেছনে বাংলাদেশের কোনো ভূমিকা নেই। সমস্যার সৃষ্টি ও কেন্দ্রবিন্দু মিয়ানমারে, সমাধানও সেখানেই নিহিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়– এই নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে তাঁর সরকার সব সময়ই কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে গণমাধ্যম ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়েছে। নিশ্চিত করা হয়েছে তাদের স্বাধীনতা। নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বলে প্রধানমন্ত্রী উক্ত সম্মেলনে মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদ আজ আর কোনো নির্দিষ্ট দেশের সমস্যা নয়, এটি বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে জঙ্গিবাদ সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবের ফলে বাংলাদেশই সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য যেসব সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নের প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী। এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে সিপিএ'র সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সিপিএ নির্বাহী কমিটির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সিপিএ'র চেয়ারপারসন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী। পরে তিনি সিপিএ'র প্যাট্রন ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের বাণী পড়ে শোনান। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন এবং সিপিএ'র কার্যক্রম নিয়ে দুটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়।

ঢাকায় হোটেল র‍্যাডিসনে ২ থেকে ৪ নভেম্বর সিপিএ'র স্মল ব্রাঞ্চ এবং নির্বাহী কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটির বৈঠক হয়।

সিপিএ'র নতুন চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন ক্যামেরুনের ডেপুটি স্পিকার এমিলিয়া মনজোবা লাফাকাও। সিপিএ সম্মেলনে এক বিবৃতিতিতে উল্লেখ করা হয়, মিয়ানমার সরকার রাখাইন প্রদেশে যা করেছে তা চরম অন্যায়। এছাড়া বিবৃতিতে রোহিঙ্গাদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়া এবং তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

লেখক : কলাম লেখক ও কথাসাহিত্যিক

নিবন্ধ

জেল হত্যা

জাতিকে মেধাশূন্য করার ঘৃণ্য প্রয়াস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

জেলখানা কয়েদিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আর সেই আশ্রয়স্থল যদি কেউ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তির নির্দেশে চিহ্নিত ব্যক্তিদের স্টেনগানের গুলি ও বেয়নেট দিয়ে কয়েদিদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে, তাহলে রাষ্ট্রের নিয়মনীতি বা মানবতা কোথায় থাকে।

বাংলাদেশের সে এক অন্ধকার সময়। সময়টা শুরু হয়েছিল '৭৫-এর ১৫ আগস্ট, শেষ হয়েছিল '৯৬-এর সালের ২৩ জুন। মাঝে ১৫ আগস্টের নীল নকশার অসমাপ্ত কাজের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে '৭৫-এর ৩ নভেম্বর। এদিন হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে।

'৭৫-এর ১৫ আগস্ট সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে প্রাণ হারাতে হয় এবং তিন মাসের মাথায় প্রাণ হারাতে হয় তাঁর আজীবন সহযোগী-সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে। তাঁদের প্রাণ হারাতে হয় বাংলার আরেক মীরজাফার খোন্দকার মোশতাক, চাকরিচ্যুত একদল মেজর এবং মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী ও পাকসেনা বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্রের কারণে। কাজেই বাংলাদেশের ইতিহাসে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও '৭৫-এর ৩ নভেম্বর কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ ঘটনার নাটের গুরু খুনি মোশতাক। এই লোকটি '৭৫-এ কলকাতাতে থাকাকালেই ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে পর্দার আড়াল থেকে তিনি আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তি এবং দেশি শত্রুদের কাছে টানেন। তার ছয় মেজর, জিয়াউর রহমান এবং তাহের ঠাকুরসহ মোয়াজ্জেম, ওবায়দুর রহমান ও মাহবুব আলম চাষি তো আছেই। প্রয়োজনে কিসিঞ্জারের ভাবশিষ্য মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টারের পরামর্শ নেয়া। এভাবেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মহানায়ক শেখ মুজিব এবং বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সহচরদের হত্যার সুপরিকল্পনা করা হয়।

খুনিদের ১৫ আগস্টের লিস্টে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও জাতীয় চার নেতার নাম ছিল। কিন্তু খুনি ফারুক, রশীদ, ডালিম গংদের কিলিং অভিযানে ভোর হয়ে যাওয়াতে ঐ তারিখে তাঁরা রেহাই পান। কিন্তু খুনিদের নীল নকশা বাস্তবায়ন তো হয়েছেই সেই নভেম্বরের ৩ তারিখে।

কেন এই ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর? কেন জেলখানায় অবৈধভাবে ঢুকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান প্রধান সংগঠকদের নির্মমভাবে হত্যা? গত ৪২ বছর ধরে এই জিঘাংসার হত্যাকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন: স্বাধীনতাবিরোধীদের অপকর্ম এবং '৭১-এর পরাজয়ের বদলা নিতে তারা জেল হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, যা ঠান্ডা মাথায় এবং সুপরিকল্পিত।

একটু পিছনে ফিরতেই হয়। '৪৭-এর দ্বিজাতিতত্ত্বের সেই বাপদাদাদের স্বাধীনতা আমাদের পাকিস্তানের অধীন করেছিল। ভাষার শোষণ থেকে সকল প্রকার শোষণ শুরু হয়েছিল পূর্ববাংলার মানুষের ওপর। তখনকার তরুণ তুর্কী শেখ মুজিব সহসা তা উপলব্ধি করেন এবং বাঙালির অধিকার আদায়ে সংগ্রাম শুরু করেন। শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থা ছিল সেনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত। বার বার সেনা কর্মকর্তা ক্ষমতায় এলে বাঙালিদের শোষণ-নির্যাতন বেড়ে যায়। বঙ্গবন্ধুকে তারা বার বার অন্তরীণ করে। আগরতলা মামলা সাজায়। একাত্তরের প্রহসনের মামলায় তাঁকে ফাঁসির দণ্ডাদেশও প্রদান করে, কিন্তু বাঙালির গণজাগরণ তথা মুক্তির সংগ্রাম থেমে যায়নি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ চলেছে। ভারত-রাশিয়াসহ স্বাধীনতাকামী বিশ্বের মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন আমাদের প্রতিশত্রু হয়ে পাকিস্তানিদের সাহায্য করেছে। কিন্তু বাঙালির ৩০ লক্ষ মানুষ আর ২ লক্ষ মা-বোনদের সম্ভ্রমহানি বৃথা যায়নি। অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা। পরাজিত করে বন্দি করেছিলাম পাকিস্তানি সৈন্য ও এদেশীয় তাদের তাবেদারদের।

অবশেষে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ফিরে এলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য আত্মনিয়োগ করলেন। নতুন সংবিধান উপহার দিলেন জাতিকে। ধর্ম ব্যবসায়ীদের

সৈয়দ নজরুল ইসলাম *তাজউদ্দীন আহমদ* *ক্যাপটেন এম মনসুর আলী* *এএইচএম কামারুজ্জামান*

রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেন। মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করলেন এবং এ সংক্রান্ত ধারাও সংবিধানে প্রতিস্থাপন করলেন।

কিন্তু পর্দার আড়ালে থাকা '৭১-এর দেশি-বিদেশি শত্রুগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। যারা বঙ্গভঙ্গের সমর্থনকারীদের উত্তরসূরি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত কজন মেজর, নাটের গুরু মীরজাফর খোন্দকার মোশতাক এবং জিয়া, গোলাম আজমসহ কিছু কুলাঙ্গার '৭১-এর বদলা নিতে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করে। খুনি মেজররা মসনদে বসায় মোশতাককে। মোশতাক প্রধান সেনাপতি বানায় জিয়াকে। আবার খুনিদের খুন করার দায় থেকে মুক্তির অধ্যাদেশ জারি করে। জিয়া তা সংবিধানে ঢুকিয়ে দেয়। তারা সবকিছু করে অবৈধভাবে। সংবিধানকে ছুড়ে ফেলে দেয় বুড়িগঙ্গায়।

তখনো মীরজাফর মোশতাক মসনদে আসীন। খুনি মেজররা তার পাহারাদার। মোশতাকের চোখে ঘুম নেই। ১৫ আগস্টের কিলিং অপারেশন সম্পূর্ণ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর একান্ত অনুচররা তখনো তার বাগে আসেনি, এমনকি তার কর্মকাণ্ডকে সমর্থনও করেনি। সময় পার হলেই তাঁরা আবার বদলা নেবে। তাই তাঁদের আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। খোন্দকার সিদ্ধান্ত নিল জেলখানার অভ্যন্তরেই তাঁদের হত্যা করা হবে। নিজেই টেলিফোন করে ফটক খুলে দিতে বলল। তারপর ১৫ আগস্টের চিহ্নিত খুনিরা বঙ্গবন্ধুর সহচর ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকদের ঠান্ডা মাথায় হত্যা করল। বাঙালির ঘুরে দাঁড়ানোর কেউ রইল না। তারপর বাংলাদেশের শাসনভার অবৈধদের দখলে চলে গেল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশ হলো। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন উবে গেল। উপরন্তু তাঁর অনুসারীদের ওপর নেমে এল নির্যাতন, হত্যা ও নিপীড়ন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এ সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে অবস্থান করায় বিধাতার অসীম কৃপায় বেঁচে যান। ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা ভয়ডর উপেক্ষা করে গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর মতো সংগ্রাম, আন্দোলন ও ভোট-ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেন। অবশেষে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে তিনি '৯৬ সালে ক্ষমতায় আসীন হন এবং জেলখানায় যেখানে জাতীয় নেতাদের হত্যা করা হয় সেখানে ভাস্কর্য স্থাপন করেন ও খুনিদের হত্যার বিচারের আইনি জটিলতা দূর করেন, যা দেশবাসীর অজানা নয়। ৩ নভেম্বরের ঘটনা সম্পর্কে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিছু সময়' শীর্ষক একটি রচনায় লিখেছেন–

'আমরা এখান থেকে গেলাম জাতীয় চার নেতাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছিল সেই জায়গায়। সেখানে হেঁটেই গেলাম। আব্বার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান। এই চারজনকে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে কারাগারে বন্দি অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করে। কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে ঢুকে হত্যা করার ঘটনা সভ্য জগতে বোধ হয় এই প্রথম। বাইরে থেকে অস্ত্রধারীরা ঢুকে একের পর এক হত্যা করে এই চার নেতাকে। এখানে বেদিতে ফুল দিলাম। চারটা স্তম্ভে চারজনের ভাস্কর্য করা হয়েছে। পানির ফোয়ারার ভেতরে এই ভাস্কর্যগুলো তৈরি করা হয়েছে। এখনো গরাদে বুলেটের চিহ্ন রয়ে গেছে। দেয়ালের গায়ে যে বুলেটের চিহ্ন ছিল তা মেরামত করা হয়েছিল বহু আগেই। সেই চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাজউদ্দীন সাহেবের দুই মেয়ে রিমি ও মিমি, মনসুর আলী সাহেবের ছেলে মো. নাসিম এবং কামারুজ্জামান সাহেবের ছেলে রাজশাহীর বর্তমান মেয়র লিটন উপস্থিত ছিল।

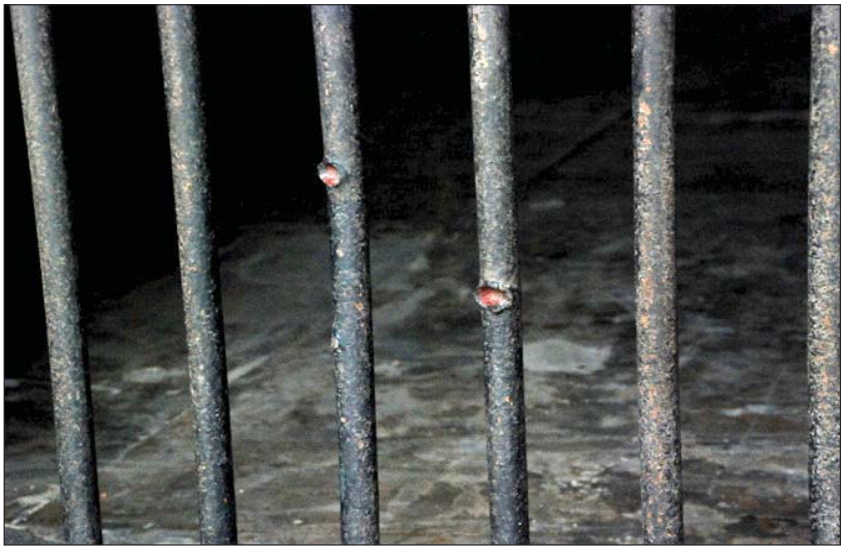

এই কক্ষেই জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল। বুলেটের চিহ্ন আজও সেই সাক্ষ্য বহন করছে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। তাজউদ্দীন সাহেব প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ক্যাপটেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধু যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবেই তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। প্রতিটি সংগ্রামে অংশ নিয়ে জেল - জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয় অর্জন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়টা ঘাতকের দল মেনে নিতে পারেনি। যে কারণে পরিকল্পিতভাবে ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করে, আর ৩ নভেম্বর জেলখানায় হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তির দালালরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এই জিঘাংসা চরিতার্থ করে। জাতি চিরদিন এই খুনি ও ষড়যন্ত্রকারীদের ঘৃণা করে যাবে।'

জানা সত্ত্বেও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, '৯৬ সালে দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের আবার '৭১-এর মতো বিজয় ঘটে। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর অনুসারীদের খুনের দায়ে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। দেরিতে হলেও কারো ফাঁসির রজ্জু পরতে হয়। কিন্তু জেল হত্যার মামলাটি আদালতে ঝুলতে থাকে। এ পর্যায়ে জোট সরকারের আমলে এ মামলাটির একটি তথাকথিত রায় দেওয়া হয়। এ রায়ে একজন বাদে সবাইকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। সেই প্রহসনের বিচার দেশবাসী গ্রহণ করেনি। মামলাটি পুনরায় বিচারের জন্য আদালতে উঠেছে। '৭১-এর চেতনায় বিশ্বাসী গোটা দেশবাসীর আশা, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মতো জাতীয় চার নেতার প্রকৃত খুনিদের বিচারও বাংলার মাটিতে হবে। মানুষ হত্যার পরিণাম যে কখনো ভালো হয় না, তা খুনিদের উত্তরসূরিরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবে এবং মানবতার জয় হবে।

আমরা প্রতিবছর নভেম্বরের ৩ তারিখ জেল হত্যা দিবস পালন করি এবং গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে স্মরণ করি। তাঁরা বাংলা মায়ের কৃতী সন্তান। তাঁদের অবদান চির অম্লান। তাঁরা বাঙালির ইতিহাস স্রষ্টা।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক

নিবন্ধ

৩ নভেম্বর : জেল হত্যা দিবস

জাতীয় চার নেতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা

ফারুক নওয়াজ

৩ নভেম্বর, ঐতিহাসিক জেল হত্যা দিবস। ১৯৭৫-এর সেই রাতে ঘটেছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের জঘন্যতম ও বেদনাবিধুর পর্বের শোকাবহ অধ্যায়টি। উল্লেখ্য, '৭৫-এর ১৫ আগস্ট মাঝরাতে সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় দেশদ্রোহী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে জাতিকে আবার অধীনতার শেকলে জড়াতে চেয়েছিল। তাদের অভিসন্ধি ছিল সুদূরপ্রসারী। তারা ভেবেছিল, শুধু বঙ্গবন্ধুকেই নয়, তাঁর উত্তরাধিকারীদের সমূলে বিনাশ না করলে এদেশকে চিরকালের জন্য অধীনতায় বাঁধা যাবে না। এই কুভাবনা থেকেই কুখ্যাত ঘাতকচক্র ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে আকস্মিক হামলা করে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তাঁর শিশুপুত্র রাসেলসহ তিন পুত্র, সদ্য বিবাহিত দুই পুত্রবধূ, বেড়াতে আসা বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোটো ভাইকেও তারা পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। জাতির পিতার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেল জামিলকেও তারা বত্রিশের কাছে পথেই নির্মমভাবে হত্যা করে। এছাড়াও বত্রিশের বাইরে বঙ্গবন্ধুর স্বজনদেরও তারা রেহাই দেয়নি। তারা একইভাবে ওই রাতে হত্যা করে আবদুর রব সেরনিয়াবাত, শেখ ফজলুল হক মণি, বেগম আরজু মণি এবং কয়েকজন শিশুসহ আরো কয়েক জনকে। শুধু বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা সেসময় বিদেশে অবস্থান করায় ঘাতকদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হননি। কেন তারা সেই রাতে শিশু ও নারীদের হত্যা করেছিল সেটা ভাবার বিষয়।

উল্লেখ্য, যে কয়েকটি ঘটনা বাংলাদেশকে তার কাঙ্ক্ষিত অর্জনের পথে বাধা তৈরি করেছে, জেল হত্যা একটি। বাঙালি জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করতে ৪২ বছর আগে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং জাতীয় চার নেতা হত্যার সময়ের মধ্যে মিল লক্ষ করা যায়। উভয় হত্যাকাণ্ডই তারা ঘটিয়েছিল মধ্যরাতে।

তারা জানত, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে দেশ ও জাতিকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা রাখেন এই চার নেতা। কারণ, এই জাতীয় চার নেতাই বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী এই চার নেতা বাঙালি জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ঐতিহাসিক ধানমন্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। পরে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ একটি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধুর অপর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এএইচএম কামারুজ্জামান ও ক্যাপটেন মনসুর আলী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতি ও কৌশল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হওয়ার পর দেশে এক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে গঠিত সরকারে যোগদানের প্রস্তাব জাতীয় চার নেতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ কারণেই বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার সবচাইতে ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক সদস্য হিসেবে পরিচিত এবং তৎকালীন স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের প্ররোচণায় এক শ্রেণির উচ্চাভিলাসী মধ্যম সারির জুনিয়র সেনা কর্মকর্তারা প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম মনসুর আলীকে গ্রেফতার করে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ৩ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী এই চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি সেদিন এই চার নেতাকে শুধু গুলি চালিয়ে ক্ষ্যান্ত হয়নি, কাপুরুষের মতো গুলিবিদ্ধ দেহগুলোকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে। ইতিহাসের এই নিষ্ঠুরতম হত্যার ঘটনায় শুধু বাংলাদেশের মানুষই নয়, স্তম্ভিত হয়েছিল গোটা বিশ্ব। কারাগারে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা অবস্থায় এ ধরনের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

ঘটনার পরদিনই ৪ নভেম্বর তৎকালীন কারা উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি প্রিজন) আবদুল আউয়াল লালবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলায় বলা হয়, রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনের নেতৃত্বে চার-পাঁচজন সেনাসদস্য কারাগারে ঢুকে চার নেতাকে গুলি করে হত্যা করে। পরে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। নির্মম এ হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই বিচারের দাবি চলছে। ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে উচ্চ আদালতের রায়ে আত্মস্বীকৃত খুনিদের প্রায় সবাই খালাস পাওয়ার পরও বিচারের দাবি এতটুকু কমেনি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে জেল হত্যা মামলা প্রক্রিয়া পুনরুজ্জীবিত করে। আর বছরেরও বেশি সময় ধরে এর বিচার কাজ চলার পর ২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর মামলাটির রায় ঘোষণা করা হয়। রায়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০ জন আসামির মধ্যে ১৫ জনের সাজা হয়। এর মধ্যে তিন সাবেক সেনা কর্মকর্তার ফাঁসি এবং ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফাঁসির রায় কার্যকর হয়েছে। এখন দেশবাসী আশায় বুক বেঁধেছে, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার মতো জেল হত্যাকাণ্ডের অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে ঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হবে। তাহলেই দেশ হবে কলঙ্কমুক্ত। ৩ নভেম্বর জাতীয় চার নেতার শাহাদত বার্ষিকীতে –এটাই জাতির প্রত্যাশা। জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

লেখক : সম্পাদক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং টেকসই উন্নয়ন

সাদিয়া সুলতানা

বর্তমান সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে আর্থিক মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বৃহত্তম সমতা অর্জনের পথে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এক বিপুল সম্ভাবনার দেশ। অতীতে এদেশের সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরব ও ইউরোপ থেকে বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আসত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব নিয়েই দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ঘটানো। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধিতে শিল্পকারখানার অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানো এবং বাংলাদেশের মতো নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে এর অংশীদার দ্বিগুণ করা।

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য আর্থিক সেবার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সুযোগ তৈরি করা, বিশেষ করে দেশের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে কম সুদে ঋণ প্রদানসহ সমন্বিত বাজারে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা। সেই লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা অনুযায়ী শিল্পকারখানাগুলোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা, সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ানো এবং নিরাপদ ও পরিবেশ সহায়ক উন্নত প্রযুক্তি ও উদ্যোগ অবলম্বন করে টেকসই শিল্প বিকাশ করা।

দেশের ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে ৪৬৪টি চালু প্রতিষ্ঠানে এযাবৎ ৪.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। ২০০১-২০০৮ সময়ে ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৯-২০১৬ পর্যন্ত এই বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ১৭৯%।

বর্তমান সরকার পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত অঞ্চলসহ দেশের সম্ভাবনাময় এলাকাসমূহে অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) গঠন করেছে। অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে 'রূপকল্প-২০২১'-এর আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টির পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্তমান সরকারের রয়েছে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ। টেনারি শিল্প সাভারে স্থানান্তর এমনি একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সে পরিকল্পনা অনুসারে দক্ষতার সঙ্গে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনে সরকারের প্রবল সদিচ্ছার কারণেই প্রত্যাশার চাইতে অধিক হারে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে। দেশে শিল্পবান্ধব নীতি অনুসরণ করার ফলে গড়ে উঠেছে নতুন-নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান। সহজ শর্তে লোন পাচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা। যা 'এসএমই' নামে পরিচিত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে কৃষিনির্ভর শিল্প, পোলট্রি, কৃষি, মৎস্য ও দুগ্ধ খামার। এগুলো দেশের অর্থনীতিতে যেমন অবদান রাখছে তেমনি ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে এনে দিয়েছে উন্নয়ন ও স্বস্তি। কোনো দেশের টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। এলক্ষ্যে গাভি পালনে উদ্যোক্তাদের ৫% সুদে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। ভেড়া পালন, মহিষ পালনকারীদের ৫% হারে ব্যাংক ঋণ সুবিধা দেবার চিন্তাভাবনা করছে সরকার।

বাংলাদেশে যুগান্তকারী শিল্পকারখানা গড়ে উঠছে। দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। দেশীয় প্রযুক্তির ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ উদ্ভাবন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বদলে গেছে দৃশ্যপট। বাংলাদেশে উৎপাদিত যন্ত্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি যন্ত্রাংশ এখন চীন-ভারতের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশ্ববাজারে স্থান করে নিচ্ছে। এর

কিছুদিন আগেও এদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি যন্ত্রাংশের জন্য বাংলাদেশ শতভাগ আমদানি নির্ভর ছিল কিন্তু, আজ দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। কোথাও ব্যক্তিপর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অভাবনীয় এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ঢাকার ধোলাইখালের মোটর পার্টস ও মেশিনারিজ শিল্প, কেরানীগঞ্জের জিনজিরা বহুমুখী শিল্পায়ন ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠছে একেকটি যুগান্তকারী শিল্পকারখানা। শুধু ঢাকায় নয় ঢাকার বাইরেও গড়ে উঠছে এই ক্ষুদ্র মেশিনারিজ শিল্প পল্লি। বগুড়া, রংপুর, জয়পুরহাট, যশোর ও পাবনায় গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি মেশিনারিজ শিল্প। জানা যায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নিয়ে সরকারের রয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। আশার কথা দিনে দিনে নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়ছে। সরকারের শিল্পবান্ধব উদ্যোগের ফলে বেকারদের জন্য এসএমই খাত (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প) বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তেমনি জয়পুরহাটের পোলট্রি দেশের চাহিদা মেটাচ্ছে। পঞ্চগড়ে ঘটেছে চা উৎপাদনে বিপ্লব। বগুড়ার কৃষি যন্ত্রাংশ দেশে-বিদেশে চাহিদা মেটাচ্ছে। গাড়ির বডি তৈরি হচ্ছে যশোরের শিল্পকারখানায়, রংপুরের শতরঞ্জি আজ বিশ্ব দরবারে সমাদৃত হচ্ছে।

ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষা জিনজিরা-শুভঢ্য থেকে শুরু করে কেরানীগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়েই এসএমই শিল্পের অভাবনীয় বিস্তার। গোটা এলাকায় চলছে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ। গড়ে উঠেছে ২ হাজারের বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকারখানা আর এতে ১২ লাখ কারিগর গড়ে তুলেছে সম্ভাবনার আর এক বাংলাদেশ।

রেল-বিমানের যন্ত্রাংশ, মোবাইল ফোন সেট থেকে শুরু করে সমুদ্রগামী জাহাজ পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নয় অনেক কারিগর, তারা ইঞ্জিনিয়ার নয় অথচ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ফলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পণ্য তৈরি করছে। জাপান, চীন, কোরিয়া যেসব সামগ্রী উৎপাদন ও বাজারজাত করে, জিঞ্জিরার কারিগররা এক নজর পরখ করে সেসব দ্রব্যাদি ও যন্ত্রাংশ তৈরি করতে পারে। সরকারি পুঁজি সহায়তায় অনেক মাঝারি কারখানায় আশানুরূপ পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে উৎপাদিত অনেক পণ্যই রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা যায় যে, জিঞ্জিরাকে অনুসরণ করে দেশজুড়ে ৪০ হাজারেরও বেশি শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। ২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের হালকা প্রকৌশল শিল্পে বছরে টার্নওভার ২৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। বর্তমানে এ খাত থেকে সরকারের রাজস্ব আয় হচ্ছে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। এসএমই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে ৬ লাখ শ্রমিক এবং আরো ৬০ লাখ কর্মী পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে। ইতোপূর্বে এ খাতে কৃষিভিত্তিক শিল্প, চামড়া শিল্প, আগর-আতর, প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্য, সেবা খাত, প্রশিক্ষণ, ওষুধ শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এমএসই'র জনৈক কর্মকর্তা সূত্রে জানা যায়, দেশ থেকে যে আগর-আতর রপ্তানি হয় ৪-৫ হাজার ডলারে, অথচ সেই পণ্য দিয়ে স্প্রে তৈরি করে বিক্রি করা হয় ৬০ হাজার ডলারে। এগুলো দেশে উৎপাদন করা গেলে আমাদের অর্থনীতিতে বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে টেকসই শিল্পায়নের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে। সে লক্ষ্যে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে শিল্পকারখানায় অংশীদারিত্ব বাড়ছে ক্রমান্বয়ে।

উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র বগুড়ায় কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘটে গেছে নীরব বিপ্লব। বিসিক শিল্প নগরীসহ বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির ৭ শতাধিক কলকারখানা। জানা যায়, জাতীয় অর্থনীতিতে কয়েক হাজার কোটি টাকার যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে বিশাল অবদান রাখছে ঐসব স্থানীয় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলো। স্থানীয় কৃষকের চাহিদা মিটিয়ে এসব কৃষি যন্ত্রপাতি ভারতসহ অন্যান্য দেশেও রপ্তানি হচ্ছে। সরাসরি এ খাতে শ্রম দিচ্ছে প্রায় ১ লাখ কর্মী।

স্থানীয় কারখানাগুলোতে তৈরি হচ্ছে পানির পাম্প, টিউবওয়েল, শ্যালো ইঞ্জিনের লাইনার পিস্টন, পাওয়ার টিলার, ধান ও ভুট্টা মাড়াই মেশিনসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ। এছাড়াও প্লানার,, ক্রাংক শ্যাফট প্লানডিং, মিলিং পেপার, বোরিং মেশিন, লেদ মেশিন, স-মেশিন ইত্যাদি তৈরি হয় এসব কারখানায়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে দেড় লাখ মানুষ স্বাবলম্বী হয়েছে। ২০ একর জমিতে গড়ে উঠেছে শিল্প নগরী, সেখানে ২৭টি কারখানা স্থাপিত হয়েছে ব্যক্তিগত উদ্যোগে। ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ সুবিধা নিয়ে গড়ে তুলেছে শতাধিক কুটির শিল্প। রংপুরে তৈরি শতরঞ্জি ও বেনারসি আজ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিসিক সূত্রে জানা গেছে, বিসিক শিল্প নগরীতে রয়েছে ২৭টি কারখানা। অনেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তুলছে শতরঞ্জি, বেনারসি ও পাপোশ কারখানা– যা ৩৬টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

গত কয়েক বছরে জয়পুরহাটে ক্ষুদ্র শিল্পের বেশ প্রসার ঘটেছে। পোলট্রি শিল্পের বিকাশ উল্লেখ করার মতো। গত ৫ বছরে ছোটো-বড়ো ৩২টি মুরগির বাচ্চা ফুটনোর হ্যাচারি, ১১টি পোলট্রি ফিড মিল ও ৬ হাজার মুরগির খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জানা যায়, ব্যাংক ঋণ সহজ হবার ফলে শিল্পকারখানা স্থাপনে উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হচ্ছে। উক্ত অঞ্চলে কয়েক বছরে চা উৎপাদনে বিপ্লব ঘটেছে। উক্ত জেলায় ৫ হাজার একর জমিতে বছরে প্রায় ১৫ লাখ কেজি চা উৎপাদিত হচ্ছে। এ জেলায় চা উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩০ হাজার শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। চা উৎপাদনের মাধ্যমে এই এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা আমূল বদলে গেছে।

যশোর-খুলনা মহাসড়ক ধরে দুইপাশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ। ছোটো-বড়ো প্রায় ৪ হাজার ওয়ার্কশপ রয়েছে উক্ত এলাকায়। জানা যায়, নতুন-পুরাতন মিলে প্রতিমাসে যশোরে ৫ শত বাস ও ট্রাকের বডি নির্মাণ হয়। সেই সঙ্গে নির্মিত হচ্ছে কাভার্ড ভ্যান ও পিকআপ ভ্যানের বডি। হস্তশিল্পের পাশাপাশি পাথর ভাঙার মেশিন রপ্তানিতেও যশোরের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অবদান রাখছে।

নারীদের জন্য ব্যক্তি উদ্যোগে স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে তোলা হচ্ছে নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান। নারীদের জীবন ও জীবিকায় বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অবদানের ফলে নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। ঘর-গৃহস্থালির মধ্যে জীবন বেঁধে রাখা নারীরা এখন অবসর সময়টুকু উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করছেন। অনেক শিল্পকারখানা শতভাগ নারী দ্বারা পরিচালিত। ঢাকার লালবাগের রহমতগঞ্জ এলাকায় রয়েছে এমনি শিল্পকারখানা– যা নারী শ্রমিকদের আর্থসামাজিক জীবনে এনে দিয়েছে স্বস্তি।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক

নিবন্ধ

৭ মার্চের ভাষণ

ইউনেস্কোর স্বীকৃতি বিশাল গৌরবের

সৈয়দ শাহরিয়ার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত '৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে যুক্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতি বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষার জন্য বিশাল গৌরবের। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ ছিল প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা। ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ করায় ইউনেস্কো এবং এর মহাসচিব ইরিনা বোকোভাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

১৯৭৫ সাল, ১৫ আগস্ট একটি শোকাবহ দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর সামরিক শাসন এবং পরবর্তী সময়ে বিএনপি-জামায়াত জোট জাতির পিতার এই ভাষণ নিষিদ্ধ করেছিল। গণমাধ্যমে এর প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ ভালোবেসে এই ভাষণকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল।

১৯৪৭ সাল। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। বাঙালিরা অর্থনৈতিক-সামরিক-সাংস্কৃতিক বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। এভাবেই চলে দীর্ঘ ২৩ বছর। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ভাষার ওপর আঘাত হানে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মুখের ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ নেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে প্রতিবাদ করেন। তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয় বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সংগ্রাম। বাঙালির ওপর ক্রমান্বয়ে নেমে আসে অত্যাচার-নির্যাতন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন '৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন– বিজয়ের পথ ধরে এগোয় বাঙালি গণমুক্তি সংগ্রাম এক যৌক্তিক পরিণতির দিকে।

বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফা ঘোষণার অপরাধে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে প্রথমে কেন্দ্রীয় কারাগারে, পরে কুর্মিটোলায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দি রাখে।

বাঙালি বীরের জাতি। কোনোকিছুতেই তাদের দাবিয়ে রাখা যায়

৭ মার্চ ১৯৭১ : রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ঐতিহাসিক ভাষণ দিচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে সংস্থাটির মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দেওয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জ্বালাময়ী সেই ভাষণটিকে 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' (প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে ঘোষণা করেন

না। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তারা বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে আনেন। আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচনে সমগ্র দেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। চলতে থাকে বাঙালির ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনসভার ডাক দেন। সেই জনসভায় বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের আবশ্যকতা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল এ ভাষণের মূল লক্ষ্য।

শত্রুর মোকাবিলায় তিনি বাঙালি জাতিকে নির্দেশ দেন, 'তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে;। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ চূড়ান্ত লগ্নে ৭ মার্চের ভাষণ গোটা জাতিকে ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এই ভাষণের পর থেকেই পূর্ব বাংলার নিয়ন্ত্রণ বাংলার মানুষের হাতে চলে যায়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে দেশ। কিছু সেনানিবাস ছাড়া দেশের অন্য কোথাও পাকিস্তানি শাসকের কোনো নিদর্শন ছিল না। জাতির পিতার এই সম্মোহনী ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি জাতি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা আরো বলেন, জাতির পিতা ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। এর পরপরই বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। কারাগারে তিনি অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। সামরিক আদালতের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। জাতির পিতার নির্দেশে পরিচালিত নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বরে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতার এই ভাষণের দিকনির্দেশনাই ছিল সে সময়ের বজ্রকঠিন জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র, যার আবেদন আজও অম্লান। প্রতিনিয়ত এই ভাষণ তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে এবং অনাদিকাল ধরে অনুপ্রাণিত করে যেতে থাকবে। তিনি বলেন, ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু তাঁর অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার আলোকে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাঙালি জাতির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গাঁথেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে। আড়াই হাজার বছরের গণজাগরণ ও উদ্দীপনামূলক বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে ইতিহাসবিদ জ্যাকব এফ ফিল্ডের লেখা উই *শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস : দ্য স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি* গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্থান পেয়েছে। অনুপ্রেরণাদায়ী এই ভাষণ বিশ্বের ১২টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এর ধারাবাহিকতায় ইউনেস্কোর স্বীকৃতিকে আরেকটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেন শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী এ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মা বেগম ফজিলাতুন নেছাসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে শাহাদত বরণকারী সব সদস্য এবং মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

লেখক : সাংবাদিক ও কলাম লেখক

জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা

গণমাধ্যমের এক নতুন যাত্রা

মাহবুব রেজা

‘আপনারা খবরের কাগজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা –এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি এবং এইসব আদর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এটাও আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। আমরা এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতেই দেশের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে চাই। কিন্তু গণতন্ত্রের একটা মূলনীতি আছে। গণতন্ত্রের অর্থ পরের ধন চুরি, খুন-জখম, লুটতরাজ বা পরের অধিকার হরণ করা নয়। তার জনকল্যাণমূলক একটা নীতিমালা আছে। সাংবাদিকতারও এমনই একটা মূলনীতি আছে।’

[জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৬ জুলাই ১৯৭২, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা।]

এক

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যম নিয়ে বলতে গিয়ে ‘যে দেশে সংবাদপত্র স্বাধীন, সে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না’ উল্লেখ করে বলেছেন, No Substanitial famine has ever occurred in any independent and democratic country with a relatively free press। তাঁর এই কথার মূল দিক হলো একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম।

আর সেই গণমাধ্যম যখন স্বাধীন থাকে তখন তা দেশের কথা বলে। মানুষের কথা বলে। গণতন্ত্রের কথা বলে। উন্নয়ন ও সাফল্যের কথা বলে। বাংলাদেশের গণমাধ্যম তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সেই কাজটি যথার্থভাবে সম্পন্ন করছে। বাঙালির হাজার বছরের গৌরবগাথাকে বিশ্বসভায় তুলে ধরতে দেশের গণমাধ্যম কাজ করে যাচ্ছে।

সাংবাদিকতাকে বলা হয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক পেশা। সেজন্যই সাংবাদিকদের সমাজের অতন্দ্রপ্রহরী বা ‘গেট কিপারস’ বলা হয়। সাংবাদিক সমাজ-জাতির বিবেক হিসেবে চিহ্নিত; যারা রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষকে নিরলসভাবে সেবা দেয়। টমাস জেফারসনের বিখ্যাত উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, ‘Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without a government, I should not hesitate for a moment to prefer the latter.’ একটি দেশে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও ভূমিকা বোঝাতে তার এই উক্তিটি প্রাতঃস্মরণীয় বলে বিবেচিত হয়।

এক সময় বলা হতো প্রচারেই প্রসার। সম্প্রচার সংশ্লিষ্টরা কথাটিকে যথার্থ বলে মেনে নিয়ে বলছেন, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, মানুষের নিত্যনতুন প্রয়োজন ও চাহিদা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির অগ্রাধিকারের কথা মাথায় রেখে পৃথিবীব্যাপী গণমাধ্যমের সীমানা দিন দিন বিস্তৃত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। মানুষ সম্প্রচারের সব মাধ্যমকে তার প্রয়োজনে পাশে পেতে চায়। এসবকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বিশ্বব্যাপী চলছে গণমাধ্যম সম্প্রসারণের এক নীরব বিপ্লব। এই বিপ্লবের ঢেউ বাংলাদেশেও এসে পড়েছে। এই উপমহাদেশে বাংলাদেশের গণমাধ্যম বিশেষ করে সংবাদমাধ্যমের ঐতিহাসিক সুনাম রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে গড়ে ওঠা টেলিভিশন, রেডিও, অনলাইনসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে গত দেড়-দু'দশকে দেশে সম্প্রচারের ক্ষেত্র বেশ প্রসারিত হয়েছে। অবাধ তথ্যপ্রবাহের যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। গণমাধ্যমের সম্প্রসারণের ফলে মানুষ এখন খুব দ্রুতই বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের সংবাদ ঘরে বসে পেয়ে যায়। মোদ্দাকথায় বলতে গেলে সব সংবাদ এখন মানুষের হাতের মুঠোয়।

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানুষের জানতে চাওয়া ও জানতে পারা তার জন্মগত অধিকার। সুতরাং সে তার এই অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করবে এটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে সঠিক তথ্য জানা ও পাওয়ার ন্যায়সংগত অধিকার তিনি ভোগ করবেন। কিন্তু প্রশ্নটি এসে যায় যখন সেই নাগরিক সঠিক তথ্য না পেয়ে অসত্য সংবাদ পান তখন সংগতকারণেই তার ভেতরে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। সেক্ষেত্রে দেশের সরকার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতার জায়গাটির নিশ্চয়তা বিধান করে যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে না পড়ে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে পারে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা আরো বলছেন, পৃথিবীর সব দেশেই গণমাধ্যমকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করার জন্য সম্প্রচার নীতিমালা রয়েছে যার দ্বারা সংবাদমাধ্যম তথা গণমাধ্যম সংবাদ পরিবেশনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে এবং সেই নীতিমালার আলোকে সাধারণ

মানুষের জানার পরিধিকে বিস্তৃত করে। সে কারণে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন সম্প্রচার নীতিমালার প্রয়োজন।

গণমাধ্যমের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত সাংবাদিকদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সম্প্রচার নীতিমালা ঘোষণা করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করে সরকার নানা পেশার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিশেষ সেমিনার, কর্মশালা, যাচাই-বাছাই ও আলোচনার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যা সর্ব মহলে প্রশংসিত হয়েছে। এই সম্প্রচার নীতিমালার আলোকে গণমাধ্যমের অধিকার ও স্বার্থ সমুন্নত রাখতে সাংবাদিক ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে সম্প্রচার কমিশনও গঠন করা হয়েছে। স্বাধীন এই কমিশন লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স ফি নির্ধারণ, সম্প্রচার কার্যক্রম তদারকি করবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রচার নীতিমালা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে। এটাই বাস্তবতা যে, আপনি যেভাবে আপনার অধিকার ভোগ করবেন একইভাবে অন্যের অধিকারও আপনাকে সংরক্ষণ করতে হবে। বাংলাদেশের বিকাশমান সম্প্রচার মাধ্যমকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুযায়ী পরিচালনার জন্য জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, পৃথিবীর সব দেশেই সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে সবকিছু পরিচালিত হচ্ছে।

গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি ও সুপারিশের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার উন্নয়ন ও গণতন্ত্র সমুন্নত রাখতে গণমাধ্যমের প্রসার ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এ লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া বর্তমান সরকার সংবাদপত্রকেও শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেছে। ৮ম সংবাদপত্র ওয়েজ বোর্ড গঠন এবং এর সুপারিশের আলোকে সাংবাদিকদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণার পাশাপাশি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন হারও যৌক্তিক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সরকার 'সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা ২০১২' প্রণয়ন করে প্রতিবছর সাংবাদিকদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। তাদের কল্যাণে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪' জাতীয় সংসদে পাস হয়ে ইতোমধ্যে তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

গণমাধ্যমের বিকাশ ও উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের বিষয়ে বলতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকালে বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেল পরিচালনার অনুমোদন দিয়ে দেশে গণমাধ্যমের প্রসারে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিস্তৃত করতে আমাদের সরকার বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড ও সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪১টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২৪টি এফএম রেডিও সেন্টার ও ৩২টি কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এখন উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত হচ্ছে।

জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সাংবাদিকদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, বিকাশমান সম্প্রচার মাধ্যমকে গতিশীল করার জন্য এই নীতিমালা করা হয়েছে। গণমাধ্যমকে সংকুচিত করার জন্য এই নীতিমালা করা হয়নি।

দুই

গণমাধ্যমকে বলা হয় চতুর্থ স্তম্ভ। গণমাধ্যম সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গণমাধ্যম ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রাখতে পারে। দেশে বর্তমানে সাড়ে ৪ কোটির ওপর মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দরিদ্র লোকের বঞ্চনা অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ খুব কম। কেননা তারা সংগঠিত নয়। উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম শর্ত হচ্ছে জ্ঞান সম্প্রসারণ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে আমাদেরকে আগে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। যাদের তথ্যভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ, তাদের ক্ষমতায়ন তত বেশি। তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তই যুক্তিভিত্তিক সিদ্ধান্ত হয়। অবাধ তথ্যভিত্তিক সমাজ সে কারণেই হয় উন্নত।

গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা তাদের অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন, মিডিয়াকে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ জরুরি। প্রথমত, গণমাধ্যম হবে স্বাধীন; দ্বিতীয়ত, গণমাধ্যম মানসম্পন্ন

তথ্য সরবরাহ করবে; এবং তৃতীয়ত, এর পরিসর বড়ো হতে হবে, মানে জনগণের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে গণমাধ্যমের সঙ্গে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অর্থ হলো, ভয়হীনভাবে সত্যনিষ্ঠ কোনো তথ্য প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং বিশেষ কোনো স্বার্থান্বেষী মহলের কিংবা গোষ্ঠীর পক্ষ বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে কাজ না করা। যদিও গণমাধ্যমের গুণগত মান পরিমাপ করা কঠিন, তথাপি মানসম্পন্ন তথ্য সরবরাহ করার অর্থ হলো বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ ও তথ্য উপস্থাপন করা। তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং সব মত উপস্থাপন করতে হবে, যাতে পাঠককুল সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে। অন্যদিকে গুণগত মানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো, সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। তৃতীয় শর্তটি হচ্ছে, মিডিয়া কত লোকের কাছে পৌঁছাচ্ছে; মিডিয়ার ওপর লোকজনের প্রবেশ (access) কতটুকু আছে।

গণমাধ্যম মানুষের মনোজগৎ নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রেক্ষাপটে মিডিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফল বদলে দিতে পারে। স্বাধীন দেশে মিডিয়া কতটুকু জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে– তা নির্ভর করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর। কেননা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আর মুক্ত গণমাধ্যম একে অন্যের পরিপূরক। দুটোই একে অন্যকে প্রভাবিত করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষত বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে মিডিয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তিন

কী আছে এই জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালায়?

জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার ভূমিকাতে বলা হয়েছে, 'মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩৯ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের চিন্তা ও বিবেক, বাক এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠান এবং বিজ্ঞাপনসমূহ শ্রোতা ও দর্শকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এজন্যে সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহ মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা এবং বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি-না সেগুলোও বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। এছাড়া সম্প্রচার মাধ্যমসমূহের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। এসব বিষয়কে বিবেচনায় রেখে সম্প্রচার মাধ্যমের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুষম নীতিমালা থাকা সমীচীন। বর্ণিত প্রেক্ষিতে, অংশীজনদের (stakeholders) সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন (independent), বহুমুখী (pluralistic), দায়বদ্ধ (accountable) এবং দায়িত্বশীল (responsible) সম্প্রচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও বাংলাদেশের সম্প্রচার মাধ্যমসমূহকে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় আনার জন্য এ নীতিমালা প্রণীত হলো। এ নীতিমালার আওতায় 'সম্প্রচার বলতে এমন সব প্রক্রিয়াকে বুঝাবে, যার মাধ্যমে কোনো অডিও, ভিডিও এবং অডিও - ভিজুয়াল তথ্য উপকরণ (কনটেন্ট) যথা: অনুষ্ঠান, সংবাদ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি টেরেস্টিরিয়াল, প্রেরক যন্ত্র, তার (ক্যাবল)। ভূ-উপগ্রহ অথবা অন্য কোনো উপায়ে তরঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে একই সাথে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যা রেডিও, টেলিভিশন অথবা একই ধরনের অন্য কোনো ইলেকট্রনিক গ্রাহকযন্ত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়। টেরেস্টিরিয়াল, ভূ-উপগ্রহ, ক্যাবল-নেটওয়ার্ক, অনলাইন ইত্যাদি যে মাধ্যমেই হোক না কেন টেলিভিশন ও বেতারের অনুষ্ঠান, সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের কনটেন্টের ক্ষেত্রে সম্প্রচার নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।'

সম্প্রচার নীতিমালায় জনস্বার্থ, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি অপরাপর বিষয়সমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার কথাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের সামরিক বা সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস করা যাবে না, সশস্ত্র বাহিনী অথবা দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল অন্য কোনো বাহিনীর প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রুপ বা অবমাননা, অপরাধ নিবারণ ও নির্ণয়ে অথবা অপরাধীদের দণ্ড বিধানে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের হাস্যস্পদ করে, তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে এমন দৃশ্য প্রদর্শন বা বক্তব্য দেওয়া যাবে না।

এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনো বিদ্রোহ, নৈরাজ্য এবং হিংসাত্মক ঘটনা প্রদর্শন করা যাবে না।

ঘোষিত এই সম্প্রচার নীতিমালায় সাতটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পটভূমি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিমালা বাস্তবায়নের কৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লাইসেন্স প্রদান ও পদ্ধতি এবং এক্ষেত্রে সম্প্রচার কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনের একটি বড়ো ভূমিকা থাকবে। তিনি বলেন, সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচারের বিষয়ে বলা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। বিশেষ করে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি, মূল্যবোধ লালন, সংবাদ ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্প্রচার মাধ্যমকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমুন্নত এবং উন্নয়নমূলক বিষয় জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। কী কী বিষয় অনুসরণ করে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে, সে বিষয়ে বলা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে।

বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে পণ্যের মান ও ভোক্তা অধিকার সমুন্নত রাখতে হবে। বিজ্ঞাপন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সহায়ক হতে হবে। একই সঙ্গে শিশু ও নারী অধিকার সুরক্ষা করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে আরো কিছু বিবেচ্য বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। কোন কোন বিষয় সম্প্রচার করা যাবে না, করা সমীচীন হবে না তার উল্লেখ রয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে সম্প্রচার কমিশন সম্পর্কে বলা হয়েছে। কমিশন গঠন, আইনি কাঠামো, দায়িত্ব, কাজের পদ্ধতি, কী কী অভিযোগ কমিশন গ্রহণীয় ও নিষ্পত্তিসহ অন্যান্য বিষয়াদির উল্লেখ করা হয়েছে।

গণমাধ্যম বিশ্লেষকরা বর্তমান সরকারকে গণমাধ্যম-বান্ধব সরকার আখ্যায়িত করে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা নিয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করে বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে গণমাধ্যমে কর্মরতদের জন্য যে ধরনের সাংবাদিক-বান্ধব পরিবেশ ও নীতিমালার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যা তিনি ১৯৭২ সালে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে উচ্চারণ করেছিলেন, ঘোষিত নীতিমালা অনেকাংশে তারই ইঙ্গিত বহন করে। তারা বলছেন, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালার আলোকে গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের স্বার্থ ও কর্মক্ষেত্রের নিশ্চয়তা বিধান এবং দেশের ক্রমবর্ধমান সংবাদপত্র শিল্প অগ্রযাত্রার নতুন এক সড়কে যাত্রা শুরু করল– যার অংশীদার সবাই।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

এফ রহমান রূপক

একটি বাড়ি একটি খামার, ডিজিটাল বাংলাদেশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, আশ্রয়ণ, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, সবার জন্য বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, বিনিয়োগ বিকাশ ও পরিবেশ সুরক্ষা– এই ১০টি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি অর্জনে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষের উন্নয়নের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প আজ বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনের ১০টি বিশেষ উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করছে সরকার। বিশেষ উদ্যোগে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত, পরিবেশ সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিধান করছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এবং গ্রাম-শহরের উন্নয়নে ভারসাম্য তৈরি করছে। এসব উদ্যোগ নিয়ে ভিডিও ক্লিপ তৈরি করেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন। ক্লিপগুলো বেসরকারি টেলিভিশনেও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ১০টি উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।

১. একটি বাড়ি একটি খামার

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি ১জুলাই ২০১৬ থেকে 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক' নামে যাত্রা শুরু করেছে। এ ব্যাংকের ৪৯% অংশের মালিক প্রকল্পের উপকারভোগীগণ। সারাদেশে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ৪০ হাজার ২১৪টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গড়ে উঠেছে। সমিতির উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ২১ লাখ ৯০ হাজার ৭২টি। প্রকল্পের প্রত্যক্ষ উপকারভোগী ১ কোটি ২২ লক্ষ জন। বছরে প্রকল্পভুক্ত পরিবারে আয় বৃদ্ধি গড়ে ১০ হাজার ৯২১ টাকা। প্রকল্প এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা ১৫% থেকে কমে ৩% -এ দাঁড়িয়েছে। প্রকল্প এলাকায় অধিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা ২৩% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১%- এ উন্নীত হয়েছে।

২. আশ্রয়ণ প্রকল্প

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণি দুর্গত মানুষের জন্য তৎকালীন নোয়াখালীর রামগতিতে 'গুচ্ছগ্রাম' গড়েছিলেন। এ দৃষ্টান্ত সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭-এর ঘূর্ণিঝড়ে গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণ গড়ে তোলেন। ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনে ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলাও আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনবান্ধব সরকার সেই অধিকার নিশ্চিত করছে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের ৩টি পর্যায়ে ১৯৯৭ থেকে জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ১ লাখ ৩৯ হাজারেরও বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে। ৫০ হাজার পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০০২ সালে শুরু হয়েছে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, যার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৩ হাজারের বেশি পরিবার পুনর্বাসিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে ৬৩০টি প্রকল্প গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং প্রায় ৩ লাখ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। ২৭টি প্রকল্প গ্রামে জমি আছে ঘর নাই এরকম প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

৩. ডিজিটাল বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন সুখী-স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়তে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই সময়োপযোগী 'ডিজিটাল' কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা শুরু। 'রূপকল্প : ২০২১' বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ গঠন। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য জনগণের দোরগোড়ায় অনলাইন রাষ্ট্রীয় সেবা পৌঁছানো। মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ জুন ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ১০০ শাখার উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

পৌঁছানো এবং সরকারি যাবতীয় তথ্য ও সেবাকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা, ৪,৫২৭টি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার (তথ্য সেবা কেন্দ্র) স্থাপন করা। সেবা কেন্দ্রগুলো থেকে অনলাইনে ২০০ ধরনের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। ই-পেমেন্ট ও অনলাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' চালু করেছে সরকার। আইটি সেক্টরে ১২৫ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেছে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগ। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্জন করেছেন 'আইসিটি টেকসই উন্নয়ন পুরস্কার'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ জানুয়ারি ২০১৭ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে তিন দিনব্যাপী দেশজুড়ে উন্নয়ন মেলা ২০১৭- এর উদ্‌বোধন করেন

৪. শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে দিয়েছিলেন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তাঁর উদ্যোগে বাংলাদেশে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষক সরকারি শিক্ষকের পদমর্যাদা লাভ করেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার সুফল লাভ করছে শিক্ষার্থীরা। স্কুলগামী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান, মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, সকল শ্রেণির মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা এবং আইটিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষসমূহে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। দেশে শিক্ষার হার গত ৬ বছরে ৪৪ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। গত ৬ বছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ১৫৯ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। এ বছর ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে ৩৬ কোটি ২২ লক্ষ বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ১ কোটি ২২ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। ২০ হাজার ৫০০টি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন ভার্সন অর্থাৎ ই-কনটেন্ট তৈরি করা হয়েছে।

৫. নারীর ক্ষমতায়ন

নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য এবং সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে 'জাতীয় নারীর উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গে নারীরা উড়িয়েছে বাংলাদেশের বিজয় পতাকা। নারী জনশক্তিনির্ভর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। নারী ক্ষমতায়নে এ কর্মসূচি দেশে নারীদের সামাজিক অবস্থানকে দৃঢ় অবস্থানে নিয়ে গেছে। দেশব্যাপী ১২ হাজার ৯৫৬টি পল্লি মাতৃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশুর যত্নসহ যাবতীয় বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা অধিদপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মহিলা হোস্টেল নির্মাণ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সেনসিটিভ বাজেট তৈরি হচ্ছে।

৬. ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মানব উন্নয়ন ও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি বিদ্যুৎ। আর্থসামাজিক ও মানব উন্নয়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। ২০০৯ সালে শেখ হাসিনা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক অগ্রগতি আনেন। তাঁর অসামান্য অবদানে দেশের সর্বত্রই এখন বিদ্যুতের আলো পৌঁছে গেছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সৌরবিদ্যুৎ, উইন্ডমিল ও বায়োগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়াও দেশে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে পরমাণু বিদ্যুতের উৎপাদন। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণকালে বিদ্যুতের উৎপাদন ছিল ৪৯৪২ মেগাওয়াট। বর্তমানে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫৩৫১ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে ৮১টি নতুন প্লান্ট। নির্মাণাধীন রয়েছে ১৫টি এবং আরো ৪১টি প্লান্ট নির্মাণের জন্য দরপত্র দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বিগত ৭ বছরে ১ কোটিরও বেশি গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে আরো ২ কোটি মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। দেশের বিদ্যুৎ খাতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের।

৭. কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

দেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক জনগণসহ সকল জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চত করা এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এর আওতায় গর্ভবতী মায়েদের মাতৃত্বকালীন যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার সকল

সেবার সুযোগ প্রদান করা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন এবং নতুন বিবাহিত দম্পতি ও সন্তানসম্ভবা মায়েদের নিবন্ধিত করা, মা ও শিশুর খাদ্য এবং পুষ্টির বিষয়ে সহায়তা প্রদান, বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে উন্নততর চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছাতে প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে। সারাদেশে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ রোগের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

৮. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

দেশের বয়স্ক, অক্ষম জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির লক্ষ্য। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মাসিক ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। অবহেলিত, অক্ষম, নিঃস্ব জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার ১২৮টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রায় ২৫ লক্ষ অসহায় বয়স্ক মানুষকে মাসে ৪০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ৯ লাখের অধিক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীকে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ১ লক্ষ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫৫ হাজার একর কৃষিজমি বিতরণ করা হয়েছে। কর্মহীন মৌসুমে খেটে খাওয়া মানুষের আয় বৃদ্ধির জন্য চালু করা হয়েছে ৪০ দিনের কর্মসূচি। সমাজের এতিম, প্রতিবন্ধী, হিজড়া জনগোষ্ঠী, দলিত ও বেদেদের জীবনমান উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি।

৯. বিনিয়োগ বিকাশ

বিপুল সম্ভাবনার এ দেশের সৌন্দর্য এবং সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিগত দিনে আরব ও ইউরোপ থেকে বণিকেরা আসত এ দেশে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিদ্যুৎ। বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ ঘাটতি দূর করে উৎপাদন ক্ষমতা ১৫৩৫১ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে। যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন বিনিয়োগের নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে। নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। মহাসড়কসমূহ চার লেনে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দেশের অভ্যন্তরে এবং আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা সহজ হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর অত্যাধুনিক সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে উঠেছে। দেশের ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ইপিজেড-এ ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,৮৮,৮১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিয়োগ খাতে প্রবৃদ্ধি ১৪০.৫৮ মিলিয়ন ডলার। ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো বিদেশি বিনিয়োগ ১০০ কোটি মার্কিন ডলার অতিক্রম করে। ২০১৫ সালে তা ২০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার কর অবকাশসহ বিভিন্ন প্রণোদনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ইতোমধ্যে ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. পরিবেশ সুরক্ষা

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, গবেষণা, উদ্ভিজ্জ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ এ উদ্যোগের লক্ষ্য। বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও শনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণ রোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ২০০৫-০৬ সালের তুলনায় বনভূমির বিস্তার ২০১০-১৫ সালে প্রায় শতকরা ১৭.০৮ ভাগে উন্নীত হয়। ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩, ১ জুলাই ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনে বর্তমানে সনাতন প্রযুক্তির ১২০ ফুট চিমনিবিশিষ্ট ইটভাটায় ইট উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এযাবৎ শতকরা ৪৯.৮৪ ভাগ ইটভাটা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বায়ু দূষণ রোধের জন্য বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ৪৮৬.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (Clean Air & Sustainable Environment-CASE) প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট ১৮২টি শিল্পকারখানার বর্জ্য শোধনাগার প্লান্ট (Effluent Treatment Plant-ETP) স্থাপিত হয়েছে। চামড়া শিল্প থেকে ঢাকা শহর ও বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক হাজারীবাগের ট্যানারিগুলো সাভারের হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত অন্যান্য আইনগুলো হচ্ছে– বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০, পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১২। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জলবায়ু পরিবর্তন ক্ষেত্রে তাঁর সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের জন্য জাতিসংঘের পলিসি লিডারশিপ শ্রেণিতে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ ২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ জুন ২০১৬ গণভবনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বৃক্ষরোপণে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করেন –পিআইডি

লেখক : সাংবাদিক, দৈনিক গণমুক্তি

মানুষ, বৃক্ষের মতো আনত হও, হও সবুজ

(দ্বিজেন শর্মা)

রোকেয়া আক্তার

[দ্বিজেন শর্মা : জন্ম ২৯ মে, মৃত্যু ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭]

শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ১৮ আগস্ট ১৮৯১ তাঁর শরৎকালের অনুভূতি লিখতে গিয়ে লিখছেন–

'এমন সুন্দর শরতের সকাল বেলা চোখের উপরে যে কী সুধা বর্ষণ করছে সে আর কী বলব! তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণী সুন্দরীর সঙ্গে কোনো এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসাবাসি চলছে তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধসুখের ভাব-উদাস অর্ধ- গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা।'

রবীন্দ্রনাথকে জীবনের পাথেয় করে তুলে নিজের জীবনকে সাজিয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন প্রভাবকে তিনি কখনোই অস্বীকার করেননি বরং পলে পলে, ক্ষণে ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা বার বার প্রকাশ করেছেন। তাঁকে প্রকৃতিপ্রেমিক আর বৃক্ষসখা হিসেবেই দেশের মানুষ চেনেন, জানেন। তিনি দ্বিজেন শর্মা। দুবছর আগে তিনি তাঁর পঁচাশিতম জন্মদিনের এক অনুষ্ঠানে প্রকৃতির প্রতি তাঁর ভালোবাসার জানান দিতে গিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, মানব সভ্যতা এখন বিপন্ন। প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মানুষ যেন প্রকৃতিকে বাদ দিয়েই চলতে চায়। মানুষের এই ব্যবহারে প্রকৃতি এখন রুষ্ট। আমি বলতে চাই, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাতে মানুষের জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের আরেকটি নতুন করে সভ্যতা গড়ে তুলতে হবে। যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থান থাকবে।

'রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রকৃতি সাহিত্যের রাজাধিরাজ। আমি সর্বদাই কবির কাছে নতশির, কৃপা প্রার্থী, তাঁর অফুরান ভাণ্ডার থেকে দু'হাত ভরে কুড়োই সম্মোহক আনন্দের খোরাক, লিখতে বসে তুলে নিই তাঁর শব্দ ও শব্দগুচ্ছ, কাছে রাখি বনবাণী, সঞ্চয়িতা, গীতবিতান, কাব্যসাহিত্যে প্রকৃতিকে আনন্দ নিকেতন হিসেবে দেখা বহুকালের রেওয়াজ। কিন্তু প্রকৃতির ভিন্নতর একটা স্বরূপও আছে, তার প্রলয়নাচন আমাদের জীবনাভিজ্ঞতার অন্তর্গত। তা সত্ত্বেও আমরা তা দ্রুত বিস্মৃত হই, কেননা প্রকৃতিবিদ্বেষী হওয়া মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। প্রকৃতির স্পন্দ আছে, আহৃত প্রবণতা আছে মানবসত্তার গভীরে। অথচ বেঁচে থাকার জন্য আমরা সভ্যতার আরম্ভ থেকে প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বেলিপ্ত'– প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্কের জটিল সমীকরণ দেখাতে গিয়ে নিসর্গসখা দ্বিজেন শর্মা 'ডারউইনবাদ ও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনা' লেখায় এই কথাগুলোই বেশ মোটা দাগে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনার পরিসর সুবিস্তৃত... এটা স্বতঃস্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির শান্ত সুন্দর ও রুদ্র রূপ দুটিতেই আকৃষ্ট ছিলেন'।

তিনি আক্ষরিক অর্থেই প্রকৃতিকে ভালোবেসেছিলেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর প্রেম এবং মমতা এতটাই গভীর ছিল যে তা তাঁর জীবনযাপন ও লেখায় টের পাওয়া যায়। দ্বিজেন শর্মা তাঁর সারাটা জীবন প্রকৃতির জয়গান গেয়েছেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর অপার ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে সর্বদা।

নিসর্গসখা দ্বিজেন শর্মা অমর হয়ে থাকবেন তাঁর বিখ্যাত প্রকৃতিগ্রন্থ *শ্যামলী নিসর্গ*'র জন্য। প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে এই বই মূল্যবান গ্রন্থই শুধু নয়- এ এক পরম ভালোবাসার নাম। *শ্যামলী নিসর্গ* এদেশের মানুষের কাছে প্রকৃতি পাঠের প্রাথমিক সূত্র হিসেবে পরিচিত। এ বই কি শুধু উদ্ভিদ আর তরুপল্লবের বন্দনা? তাঁর এ গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়কর বলে স্বীকৃত। *শ্যামলী নিসর্গ* বইয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে নজরুল, ভারতচন্দ্র, প্রমথনাথ বিশী, খনার বচন, বাংলার প্রচলিত বাগধারা, বাংলার লোকগীতি ইত্যাদির মধ্যে যে প্রকৃতি বন্দনা ছিল তা অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে দ্বিজেন শর্মা বাঙালি পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ, পাখি গবেষক ইনাম আল হক *শ্যামলী নিসর্গ* প্রসঙ্গে লিখেছেন, দ্বিজেন শর্মার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় অনেক পরে। কিন্তু তাকে আমি জানতাম তাঁর বইয়ের মাধ্যমে। প্রথম যে বইটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তার নাম *শ্যামলী নিসর্গ*। বইটি বাংলা একাডেমি প্রকাশ করেছিল। পরে আরো সম্ভবত দুটি সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু আমি পেয়েছিলাম একেবারে প্রথম সংস্করণ। তিনি বইটি লিখেছিলেন প্রথম প্রকাশের ১৬ বছর আগে। পাকিস্তান আমলে, পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত একজন শিক্ষক হিসেবে। প্রকাশ হয়েছিল বাংলাদেশ আমলে। আমি বইটি উপহার পেয়েছিলাম সম্ভবত তারও ১৬ বছর পর।

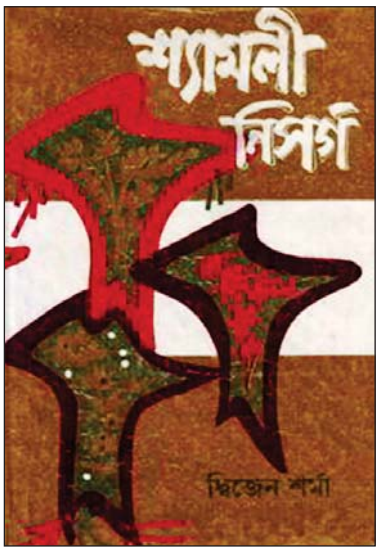

খুবই সাধারণ কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই। যখন আমার হাতে আসে, তখন সেই বইও বহু পঠনে দুর্বল, বইয়ের গাঁথুনিতে বয়সের ছাপ। তারপরও আমার কাছে অসাধারণ লেগেছিল। এত আগে এভাবে প্রকৃতি নিয়ে লিখছেন একজন! তিনি সাধারণ সব গাছপালার কথাই লিখেছিলেন। সবগুলো সাধারণ মানুষেরই পরিচিত। কিন্তু লেখা থেকে বোঝা যায় লেখক প্রকৃতিতে মগ্ন, বোঝা যায় শখের বসে সাময়িক মগ্ন নন, প্রতিদিন মগ্ন একজন মানুষ। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতির কথা এভাবে বলে গেছেন, ভেবে গেছেন- দ্বিজেন শর্মার বই পড়ার আগে কারও চোখে ধরা পড়া কঠিন।

বস্তুত সেই থেকে দ্বিজেন শর্মাকে খুঁজছিলাম। পরে জানলাম, তিনি আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে, মস্কো থাকেন। প্রগতি প্রকাশনীতে কাজ করেন। কিন্তু একবার সত্যি সত্যিই দেখা হলো। বই পাওয়ার বহু বছর পরে। আমি বইটি রেখে দিয়েছিলাম। কোথাও কোথাও টেপ দিয়ে জোড়া লাগানো। বললাম, বইটি আপনাকে চেনার স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছিলাম। পরে তার হাতে বইটি তুলে দিয়ে একটি ছবি তুললাম। [দ্বিজেন শর্মা একজনই]

১৯২৯ সালের ২৯ মে বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার সিমুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা শ্রী চন্দ্রকান্ত শর্মা ছিলেন ভিষক। মাঝে মাঝে সময় সুযোগ পেলে তিনি কবিতাও লিখতেন। মা মগ্নময়ী দেবী ছিলেন সমাজসেবী। পিতার ভেষজালয়ে ছোটোবেলায় দেখেছেন নানা ধরনের তরুলতার সমাহার। গ্রামের আশপাশে পাহাড়ি অরণ্য, গাছপালার বিচিত্র সমাহার আর রাজ্যের পাখপাখালি তাঁকে নিসর্গের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তীব্রভাবে। পাথারিয়া পাহাড়ের সবুজ রং, বর্ণিল পাখির ডানা আর উদার প্রকৃতি দ্বিজেন শর্মার ভেতরে এক অদ্ভুত বোঝাপড়া তৈরি করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে জীবনযাপনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন আমাদের বৃক্ষদের একজন প্রাতঃস্মরণীয় প্রেমিক। একজন জনপ্রিয় শিক্ষক। একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী।

এবং পরিশেষে একজন সমাজবিজ্ঞানী।

মূলত শৈশবের ঝলমলে পাথারিয়ার সেই মুক্ত প্রকৃতি আর বিশাল আকাশ তাঁর ভেতরে আলোড়ন তুলেছিল নানাভাবে। সেই আলোড়ন তাঁকে লেখক হিসেবে তৈরি হতে সাহস জুগিয়েছিল। সেই সাহসে ভর করে লিখে ফেললেন জীবনের প্রথম গল্প এবং তা ১৯৪৯ সালে আইএসসি ক্লাসের শেষ বর্ষের কলেজ বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। সেটি ছিল একটি আত্মজীবনীমূলক গল্প। এক দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষালাভের কঠোর সংগ্রামের কাহিনি। এরপর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায় তাঁর লেখার গল্প ছাপা হয়ে প্রশংসিত হয়েছিল। সেসব লেখার বিষয় ছিল অভিন্ন দারিদ্র্যের জীবনযুদ্ধ। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাজাত যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে, তা পুঁজিবাদী বিশ্বের সোভিয়েত গবেষক পণ্ডিতদের চেয়ে আলাদা।

ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিজেন শর্মা ছিলেন অসম্ভব রকমের বিনয়ী আর সদালাপী। প্রথম দেখাই মানুষকে আপন করে নেওয়ার এক বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল তাঁর। বাংলাদেশে প্রকৃতি নিয়ে লেখালেখিকে সহজবোধ্য আর প্রাঞ্জল করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর হাতের ছোঁয়া পেয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের মতো দুর্বোধ্য একটি বিষয় সহজ হয়ে উঠেছিল। তাঁর গদ্যরীতি মানুষের মনের কথাটিকে বাঙ্ময় করে তুলত। তিনি শুধু নিসর্গ নিয়ে চিন্তা করেছেন তা নয়, নিসর্গকে ভালোবাসার পাশাপাশি দেশের মানুষ, সমাজ, অর্থনীতি নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা বলেছেন। তিনি সবসময়ই চাইতেন একটা বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ার। যে সমাজ হবে আদর্শিক, বিজ্ঞান চিন্তাচেতনা নির্ভর, কর্মশীল, উন্নয়নমুখী, পরিশুদ্ধ সমাজ।

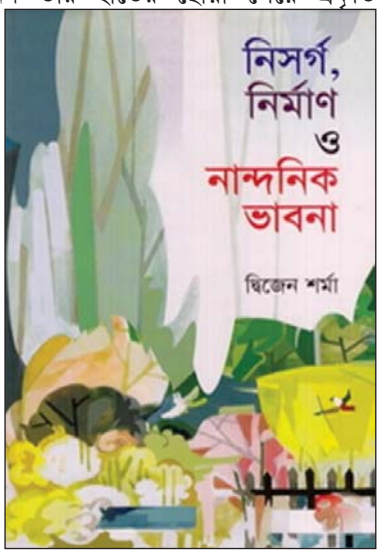

তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *শ্যামলী নিসর্গ* ১৯৮০, ১৯৯৭ বাংলা একাডেমি; *ফুলগুলি যেন কথা* ১৯৮৮, ২০০৪ বাংলা একাডেমি; গাছের কথা ফুলের কথা ১৯৯৯, শিশু একাডেমি; *এমি নামের দুরন্ত মেয়েটি* ১৯৯৫, ১৯৯৯ শিশু একাডেমি; *নিসর্গ নির্মাণ ও নান্দনিক ভাবনা* ২০০০, ইউপিএল; *সমাজতন্ত্রে বসবাস* ১৯৯৯, ইউপিএল; *জীবনের শেষ নেই* ১৯৮০, ২০০০ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন; *বিজ্ঞান ও শিক্ষা* জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন ২০০৩, দায়বদ্ধতার নিরিখ; *ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি* ১৯৯৭, সাহিত্য প্রকাশ; *গহন কোন বনের ধারে* ১৯৯৪, সাহিত্য প্রকাশ; *হিমালয়ের উদ্ভিদরাজ্যে ডালটন হুকার* ২০০৪, সাহিত্য প্রকাশ; *বাংলার বৃক্ষ* ২০০১, সাহিত্য প্রকাশ; *সতীর্থ বলয়ে ডারউইন* ১৯৭৪, ১৯৮৪, ১৯৯৯ মুক্তধারা উল্লেখযোগ্য।

লেখক : প্রাবন্ধিক

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রফেসর ড. মীজানুর রহমানের কিছু কথা

প্রশ্ন : ৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবস। জাতীয় জীবনে এ দিনের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড কোনো সাধারণ অভ্যুত্থানের ঘটনা ছিল না। এটি ছিল জাতীয় চেতনাকে ধ্বংস করা বা দেশকে পুনরায় পিছিয়ে দেবার একটি পরিকল্পিত চক্রান্তের অংশ। এই একই চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয় ৩ নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ড। এসব হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন বা কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। পরাজিত শক্তি বাঙালি জাতির মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেবার গভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবেই এসব হত্যাকাণ্ড ঘটায়। পরাজিত শক্তি বলতে আমি শুধু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের যারা বিরোধিতা করেছিল বা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিল তাদের বুঝাচ্ছি না। ১৯৪৮ সালেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তান নামক অদ্ভুত রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ বা বাঙালির অধিকার অর্জন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই আমাদের মাতৃভাষার ওপর আঘাত হানে। পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙালিদের ভাষা বাদ দিয়ে তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন বাঙালিরা তীব্র প্রতিবাদে ফেঁটে পড়ে। একে একে অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্যগুলো সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, পরবর্তীতে ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন এবং তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ–এই ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে ঘটে যেতে থাকে। বাঙালির প্রতিটি আন্দোলনেই বিরোধিতা করা হয়। বাঙালিরা যাতে কখনোই তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করতে না পারে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সেই চেষ্টাই করেছে। বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।

কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি না। মুক্তিযুদ্ধ বলি বা অন্য যে-কোনো আন্দোলনের কথাই বলি না কেন আমরা কখনোই শতভাগ ঐক্যবদ্ধ ছিলাম না। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কিছু মানুষ এর বিরোধিতা করেছে। বঙ্গবন্ধু যখন ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন তখন ২৩ দশমিক ৭৪ শতাংশ মানুষ তার বিরোধিতা করেছে। যখন রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করা হয় তখনও বেশকিছু বুদ্ধিজীবী পক্ষে ছিলেন। ১০ জন বুদ্ধিজীবী এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছেন এবং ৪০ জন বুদ্ধিজীবী এর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় থেকেই যারা এই অঞ্চলের মানুষের মুক্তিযোদ্ধার কথা বলতেন, যারা প্রগতির কথা বলতেন বা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার স্বপ্ন দেখতেন তাদের ভারতের চর বা দালাল বলা হতো। অপবাদ দেওয়া হতো যে, ভারতীয় চরেরা এদেশে ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে। তারা পাকিস্তানি শাসকদের যে-কোনো কাজকেই ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করত। পুরো পাকিস্তান আমল জুড়ে এই অবস্থা বিরাজ করে। তারা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক বিরোধিতা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি। ১৯৭১ সালে এতে তারা সরাসরি পাকিস্তানি দখলদার সামারিক জান্তার পক্ষে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রাজাকার-আলবদর বাহিনী তৈরি করে তারা পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করে। এদের অনেকেই পরবর্তীতে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর মনে করা হয়েছিল এই পরাজিত গোষ্ঠী হয়ত তাদের

ভুল বুঝতে পেরে দেশ গঠনে অংশ নেবে। কিন্তু তারা তা না করে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশেও তাদের অপকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার নির্মমভাবে হতার মাধ্যমে এই গোষ্ঠীটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে আমাদের এই দেশে যেসব প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ছিল, যারা বাঙালি অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য সব সময় সচেষ্ট ছিল তারা ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা এবং মূল্যবোধের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হয়ে পুরো চিত্রটি পালটে দেয়। তারা আবারো পাকিস্তানি ভাবধারায় দেশ পরিচালনা করতে শুরু করে। রাতারাতি বাংলাদেশ বেতার হয়ে যায় 'রেডিও বাংলাদেশ'। '৭০-এর দশকে পুরো দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তখন বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ব্লক এবং পুঁজিবাদী শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। যে কারণে বিভিন্ন দেশে প্রায়শই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটত। কিন্তু সেসব সামরিক অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবার জাতির পিতাকে হত্যার মাধ্যমে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিবর্তন আসেনি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে নবীন দেশটি আমরা লাভ করেছিলাম তাকে আবারো পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। তারা বাংলাদেশের ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তান ভাবধারায় দেশ পরিচালনার চেষ্টা করে। মুক্তিযুদ্ধের সেই অবিস্মরণীয় স্লোগান 'জয় বাংলা'র স্থলে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ চালু করা হলো। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী প্রকাশ্যে মাথাচাঁড়া দিয়ে ওঠে। তারা এই দেশটিকে মুসলিম বাংলা করার চেষ্টায় রত হয়। তারা বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণার দাবি উত্থাপন করতে থাকে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তোলা হলো। যারা মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজনীতি থেকে কার্যত নির্বাসিত হয়েছিল তাদের পুনরায় রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করা হলো। বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ শুরু করেছিলেন। যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সমর্থনে খুন, ধর্ষণ বা অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধে নিজেদের যুক্ত করেছিল তাদের বিচারের কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সেই বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। যারা শুধু বিরোধিতার জন্য মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, কোনো ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধ করেনি তাদের মাফ করে দেওয়া হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত উদার মনের একজন মানুষ। তিনি ভেবেছিলেন, এদের ক্ষমা করে দিলে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে এবং দেশের উন্নয়নে নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে পারবে। কিন্তু কথায় বলে 'কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না।' বঙ্গবন্ধুর উদারতাকে এরা মূল্যায়ন না করে বরং তার বিরোধিতা করতে থাকে। দেশে বহুমুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্য থেকে ১০০ জনের মধ্যে ৭৬ থেকে ৮০ জন অংশগ্রহণ করেন। আর পাকিস্তানি বন্দিশালা থেকে ফিরে আসে প্রায় ১ হাজার বাঙালি সেনা অফিসার। পাকিস্তান থেকে যেসব বাঙালি সেনা অফিসার ফিরে আসেন আমি বলি না তাদের সবাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তারা বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে বর্বরতা চালিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। ফলে তারা সেই ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না। তাই তারা বুঝতে পারেননি স্বাধীনতার জন্য আমরা কী মূল্যটাই না দিয়েছি। সেনাবাহিনীর ভেতরেও পাকিস্তান ফেরত এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনা কর্মকর্তাদের মাঝে এক ধরনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। স্থানীয়ভাবে কিছু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও তৈরি হলো। জাসদ নামক একটি উগ্রপন্থি রাজনৈতিক দল তৈরি হলো। তারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলতে শুরু করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের লেশমাত্র তাদের মধ্যে ছিল না। জাসদের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জলিলের পরিণতি দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে তাদের মাঝে কিছুই ছিল না। মেজর জলিল (অব.) মৃত্যুর আগে খেলাফত মজলিশে যোগদান করেন এবং পাকিস্তানে গিয়ে মারা যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় শুধু যে জামাত-আলবদররাই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তা নয়, চীনাপন্থি কমিউনিস্ট পার্টির কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। তাদের এই বিরোধিতা মুক্তিযুদ্ধের পরও অব্যাহত থাকে। ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় বিজয় দিবস পালনের সময় সিরাজ শিকদার এবং তার দল বিজয় দিবসকে 'কালো দিবস' ঘোষণা করে। মওলানা ভাসানী তাদের সেই ঘোষণাকে সমর্থন জানায়। স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র সব মিলিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সারা দেশে এক ধরনের অস্থিরতা চলতে থাকে। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। কারণ জুনিয়র কয়েকজন অফিসার গিয়ে বঙ্গভবন দখল করে। তারা অবৈধভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকারী খোন্দকার মোশতাককে দিয়ে নানা ধরনের অন্যায় কাজ করাচ্ছিল। সামরিকবাহিনীর মধ্য থেকে কিছু অফিসার যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তারা সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকেন। যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল বা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করেছিল তাদের মনে ভয় ঢুকে যায়, যদি সামরিকবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরে আসে, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি আবার যদি ক্ষমতাসীন হয় তাহলে তাদের বিপদ হতে পারে।

প্রশ্ন: তারা কেন জেল হত্যা সংঘঠিত করে?

উত্তর : বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেনাবাহিনীতে যদি শৃঙ্খলা ফিরে আসে, সংবিধান যদি পুনঃস্থাপিত হয় এবং জাতীয় সংসদ কার্যকর হয় তাহলে সংসদের নেতৃত্বে কারা আসবে এসব প্রশ্ন দেখা দেয়। অভ্যুত্থানকারীরা বুঝতে পারে জেলখানায় বন্দি চার জাতীয় নেতা বেরিয়ে আসবে এবং তাঁরাই জাতীয় সংসদ ও সরকারের নেতৃত্ব দেবে। এই চার জাতীয় নেতা সম্পর্কে তাদের ভীতি ছিল। কারণ, নানাভাবে চেষ্টা করে, চাপ দিয়ে এমনকি প্রলোভন দেখিয়েও এই চার নেতাকে তারা সরকারে নিতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এই চার নেতা ৯ মাস যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাজেই তাঁদের নেতৃত্বের গুণাবলি এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অভ্যুত্থানকারীরা সচেতন ছিল। বঙ্গবন্ধুর কোনো কোনো অনুসারী অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে হাত মেলালেও এই চার জাতীয় নেতা ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই অভ্যুত্থানকারীরা তাদের বাঁচিয়ে রাখার সাহস করেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল এই চার নেতাকে বাঁচিয়ে রাখা হলে এক সময় এরা বিপদের কারণ হতে পারে। এছাড়া এদের জনপ্রিয়তাও ছিল আকাশচুম্বি। অভ্যুত্থানকারীরা বঙ্গভবনে বসেই এই চার নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড বিরল।

জেলখানায় কোনো জাতীয় নেতাকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে নজীরবিহীন। চার জাতীয় নেতাকে হত্যার ঘটনার সঙ্গে আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের মিল খুঁজে পাই। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের স্থানীয় দোসররা যখন দেখল স্বাধীনতা কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না তখন তারা জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গভবনে অবস্থানকারী বিপথগামী সেনা কর্মকর্তারা যখন দেখল মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির পালটা অভ্যুত্থান ঠেকানো যাচ্ছে না তখন তারা জেলখানায় বন্দি চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এবং নির্মমভাবে তা বাস্তবায়ন করে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য খোন্দকার মোশতাকের অনুমোদন ছিল। হত্যাকারীরা জেলখানায় যাবার পর জেলার তাদের বাধা দিয়েছিলেন। পরে জেলার মোশতাকের সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, তারা যা করতে চায় তা করতে দিন। কোনো ধরনের বাধা দেবেন না। জেল হত্যাকাণ্ড কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। এটি ছিল একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রেরই অংশ। অভ্যুত্থানকারীরা এই চার নেতাকে বাঁচিয়ে রাখাটাকে নিরাপদ মনে করেনি। তাই তাদের হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা আর জেল হত্যা একই সূত্রে গাঁথা।

প্রশ্নঃ জেল হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে হত্যার রাজনীতি শেষ হয়নি। পরবর্তীতেও এই হত্যার রাজনীতি অব্যাহত রয়েছে বলে অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন। আপনি কী বলেন?

উত্তর: আমি এই অভিযোগের সঙ্গে একমত। আমি মনে করি, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার মধ্য দিয়ে যে হত্যার রাজনীতি শুরু হয় তারই অনিবার্য ফল হচ্ছে একই বছরের ৩রা নভেম্বর জেল হত্যাকাণ্ড। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে যে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছিল তা পরবর্তীতেও অব্যাহত রয়েছে। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে জননেত্রী শেখ হাসিনার ওপর বোমা হামলাসহ বিভিন্ন সময় তাঁকে হত্যার যেসব চেষ্টা চালানো হয়েছে তা সেই ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতা বলেই আমি মনে করি। এমনকি এক এগারোর সময় দৃশ্যত দুই নেত্রীকে দেশ থেকে বের করে দেবার যে প্রচেষ্টা (আসলে শেখ হাসিনাকেই শেষ করে দেবার চেষ্টা হয়েছিল) আমরা লক্ষ করি তাও সেই একই হত্যা ষড়যন্ত্রেরই ধারাবাহিকতা। ১৫ই আগস্ট যারা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল তাদেরই আত্মীয়স্বজন ব্রিগেডিয়ার বারি, ব্রিগেডিয়ার আমিন পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে নিয়েছিল। এই মহলটি এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ভাবধারায় নিয়ে যাবার জন্য। আজকে আমরা যাদের জঙ্গি বলি এরা কারা? হয়ত আপনি বলতে পারেন এদের তো ১৯৭১ সালে বা ১৯৭৫ সালে জন্ম হয়নি। কিন্তু আপনি বিশ্লেষণ করলে দেখবেন এরা সেই পাকিস্তানি ভাবধারা অনুসরণ করে কিছু একটা করার চেষ্টা করছে। আমি এটা জোর দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশে পাকিস্তানি ভাবধারার মানুষের অভাব নেই। বর্তমানে যে জঙ্গিবাদের উত্থান লক্ষ করা যাচ্ছে এদের টার্গেটও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাজার বছরের শাশ্বত বাঙালির চেতনা এবং মূল্যবোধ ধারণ করে চলেছেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক এবং গণতন্ত্রের মানসকন্যা। এসব কারণে জঙ্গিরা শেখ হাসিনাকেই বার বার টার্গেট করছে।

প্রশ্নঃ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর বার বারই আঘাত এসেছে। এই আঘাত কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরো শাণিত করেছে?

উত্তর: যে– কোনো প্রতিবন্ধকতা এলেই জাতীয়তাবোধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শাণিত হয়। কারণ সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চললে সেখানে চেতনা ততটা কাজ করে না। কিন্তু প্রতিবন্ধকাতে এলেই চেতনাবোধ জাগ্রত হয়। বার বার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর আঘাত এসেছে বলেই আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমশ শাণিত হচ্ছে। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের প্রসঙ্গটি। এই বিচারকার্য শুরু হলে নানামুখী ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। বিচার বাধাগ্রস্ত হবার শঙ্কা দেখা দিলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির উদ্যোগে সৃষ্টি হয় গণজাগরণ মঞ্চ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করার জন্যই গণজাগরণ মঞ্চ সৃষ্টি হয়। এটা হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি। এভাবে যখনই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর আঘাত এসেছে তখনই মানুষ নতুন করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কাজেই বলা যায়, যতবারই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ওপর আঘাত আসবে ততই এই চেতনা শাণিত হবে।

প্রশ্নঃ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক বলে মনে করেন?

উত্তর: আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। অসাম্প্রদায়িক এবং শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনও আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই ধর্মভীরু। কেউ কেউ ধর্মান্ধ নয়, এটা আমি বিশ্বাস করি না। ধর্মভীরু লোক যদি লেখাপড়া না জানে, বিজ্ঞানমনস্ক না হয় তাহলে সে ধর্মান্ধ হতে বাধ্য। ধর্মের প্রতি মানুষ যত বেশি অনুরক্ত হবে সে যদি বিজ্ঞানমনস্ক না হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত ধর্মান্ধ হতে বাধ্য। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এত সংকটের মধ্যে ১৯৭২ সালে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সেই শিক্ষা কমিশনের প্রধান করলেন দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জাতির জন্য একটি বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা। আমরা যখনই শিক্ষা নিয়ে কোনো আন্দোলন করি বলি, কুদরাত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে। এই শিক্ষা কমিশন একমুখী শিক্ষা বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছিল। বর্তমানে নানামুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু রয়েছে। আমাদের কারিগরি শিক্ষার ওপর আরো জোর দিতে হবে। বর্তমান সরকার এই ব্যাপারে সচেতন রয়েছে। বহুধা বিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে জাতীয়তাবাদী মূল চেতনা বিঘ্নিত হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে একটি বাস্তবতা। একে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে মাদ্রাসা শিক্ষাকেও বিজ্ঞানভিত্তিক করতে পারি। আমাদের দেশের কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে উর্দু। তারা আরবিও বলতে পারে না। তাদের যদি আরবি মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হতো তাহলে তারা কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারত। আমাদের কারিগরি শিক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ৫-৬ বছর আগেও কারিগরি শিক্ষার হার ছিল ৬ থেকে ৭ শতাংশ। এখন তা ১৭-১৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

প্রশ্নঃ রোহিঙ্গা ইস্যু বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা সৃষ্টি করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে এই সমস্যা ডিল করছেন তা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আর কী করণীয় আছে বলে মনে করেন?

উত্তরঃ রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সমস্যা নয়। এটা একান্তভাবেই মিয়ানমারের সমস্যা। এই সমস্যা যে শুধু মুসলমানদের নিয়ে তা নয়। আরো যেসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী সে দেশে বাস করে তারাও এই সমস্যা মোকাবিলা করছে। মিয়ানমারে ১৩৯টি জাতিগোষ্ঠী বাস করে। আর রোহিঙ্গা সমস্যা নতুন কিছু নয়। কারণ ১৯৭৮ সালেও ব্যাপকভাবে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আবার ১৯৯৬ সালে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসে। রোহিঙ্গা সমস্যা বার বারই আমাদের বিব্রত করছে। বাংলাদেশ হচ্ছে মিয়ানমারের অন্যতম নিকট প্রতিবেশী দেশ। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে প্রায় ১৩৭ মাইল সীমান্ত রয়েছে। নিকটবর্তী দেশ হিসেবে রোহিঙ্গারা কোনো সমস্যায় পতিত হলে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এছাড়া ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেও রাখাইন রাজ্যের সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগাযোগ রয়েছে। উভয় অঞ্চলের মানুষের মাঝে ভাষা এবং চেহারার মিল রয়েছে। মিয়ানমার সীমান্তে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। তার মধ্যে রোহিঙ্গা সমস্যা একটি। বর্তমান সরকার যেভাবে রোহিঙ্গা সমস্যা মোকাবিলা করে চলেছে তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। যদিও অনেকেই সমালোচনা করেন এই বলে যে, অতীতে অন্তত ২বার কয়েক লাখ রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়েছে। আমি মনে করি, অতীতে দুইবার রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো হলেও সেই উদ্যোগ কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এই সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান হয়নি। এমনকি যাদের চুক্তি করে ফেরত পাঠানো হয়েছিল তারাও আবার বাংলাদেশে এসেছে। তার অর্থ হচ্ছে সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। আমি মনে করি, রোহিঙ্গা সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে। এবারই প্রথম রোহিঙ্গা ইস্যু জাতিসংঘে উত্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানে প্রথম দফাই ছিল রোহিঙ্গা সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান করতে হবে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা সমস্যায় পড়ি। কারণ বাংলাদেশের পক্ষে এত বিশাল জনগোষ্ঠীর চাপ সহ্য করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ এই সমস্যার স্থায়ী এবং সম্মানজনক সমাধান কামনা করে। এ সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে আনান কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে। আনান কমিশনে মিয়ানমার সরকারের প্রতিনিধিত্ব ছিল। এই কমিশন তারাই গঠন করেছিল। আনান কমিশনের মোট ৮ সদস্যের মধ্যে কফি আনানসহ মাত্র তিনজন সদস্য বাইরের ছিল। অবশিষ্ট ৫জন সদস্য ছিল মিয়ানমার সরকারের মনোনীত। আনান কমিশনের মূল বিষয় হচ্ছে তিনটি। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে রাখাইন অঞ্চলের অর্থনৈতিক চিত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠী হচ্ছে রাখাইন এলাকার মুসলমানরা। আনান কমিশনের রিপোর্টে এটাই বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে হবে। যাতে এখানকার মানুষ কাজ করে বাঁচতে পারে। কমিশনের দুই নম্বর সুপারিশ ছিল এদেরকে মিয়ানমারের নাগরিকত্ব দিতে হবে। রাখাইন থেকে কোনো নাগরিক যদি রেঙ্গুনে যেত তাহলে তাদেরকে পুলিশের অফিসে গিয়ে এন্ট্রি করতে হতো। আবার আসার সময় জানিয়ে আসতে হতো। বর্তমানে আমরা রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে যে সমস্যা দেখছি এটা একান্তই তাদের নিজেদের সমস্যা, যদিও ইদানীং এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্বার্থও জড়িয়ে গেছে। রাশিয়া, চীন ও ভারতের মতো দেশ মিয়ানমারের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত রয়েছে। যে কারণে তারা চাইলেই মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারছে না। এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রেশ রোহিঙ্গা সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে। রোহিঙ্গা সমস্যা বারবারই ঘটছে। কাজেই এর একটি স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। সরকার সে লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে। অতীতে বারবার রোহিঙ্গা সমস্যার সৃষ্টি হলেও এবারের মতো পরিস্থিতি এতটা ভরাবহ আর কখনো হয়নি। সরকার মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে। ইতোমধ্যে সাড়ে ৭ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আগামীতে এই সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই যে বিপুল সংখ্যক মানুষ আমাদের দেশে চলে এসেছে তাদের জন্য আশ্রয় এবং আহারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার সাধ্যমতো এদের জন্য সবকিছু করছে। বিশেষ করে রাহিঙ্গা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এবং স্বীকৃত হয়েছে। তাঁকে 'মাদার অব হিউমিনিটি' উপাধি দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা যদি ১৬ কোটি মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে ৫/৬ লাখ রোহিঙ্গার খাবারের ব্যবস্থাও করতে পারব। তাঁর এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এবার অত্যন্ত অল্প সময়ের ব্যবধানে যেভাবে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বিশ্বের ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। এই সমস্যার দু'টি পক্ষ মিয়ানমারের ভিতরেই আছে। এর একটি গণতান্ত্রিক নেত্রী অং সান সুচি এবং অন্য পক্ষ হচ্ছে সেনাবাহিনী। মিয়ানমারে নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই গণতন্ত্র সত্যিকার গণতন্ত্র কি-না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ এখনো সাংবিধানিকভাবে মিয়ানমারের রাষ্ট্রক্ষমতা কার্যত সেনাবাহিনীর হাতেই রয়েছে। এটা বিশ্ববাসীও জানে। যে কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন ব্যবস্থা গ্রহণ করল তখন তারা মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ না করে সে দেশে মিয়ানমারের সেনা কর্মকর্তাদের ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। অবশ্য অনেকেই মনে করেন, মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে কোনো লাভ হবে না। কারণ তারা প্রায় ৪০ বছরের মতো অর্থনৈতিক অবরোধের মধ্যে ছিল। অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে তাদের দুর্বল করা যায় না। এছাড়া অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করলে মিয়ানমারে যে সামান্য পরিমাণে গণতন্ত্র আছে তাও বিদূরিত হতে পারে। মিয়ানমার ইস্যুতে চীন, ভারত এবং রাশিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল সেখান থেকে তারা অনেকটাই সরে এসেছে। এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারই অবদান। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রোহিঙ্গা ইস্যুটি লাইম লাইটে এসেছে। অনেকেই মনে করছেন, এবারই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুর স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে বের করার। মিয়ানমারের স্বাধীনতা আন্দোলনে সে দেশের মুসলমানদের বিরাট অবদান ছিল। ১৯৩৬ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তার সভাপতি ছিলেন আব্দুর রশিদ নামে একজন মুসলিম ছাত্র। সেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন সুচি'র পিতা। কাজেই মিয়ানমারের ইতিহাসে মুসলমানদের অবদান কোনোভাবেই উপেক্ষা করার মতো নয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : এম এ খালেক, উপমহাব্যবস্থাপক, বিডিবিএল, মতিঝিল, ঢাকা

হেমন্ত
বাংলার এক অনন্য ঋতু

সুলতানা বেগম

ষড়ঋতুর দেশ, ধানের দেশ, গানের দেশ এবং প্রাণের দেশ বাংলাদেশ। অপূর্ব রূপ এবং অফুরন্ত সম্ভার নিয়ে একের পর এক হাজির হয় ছয়টি ঋতু। হেমন্ত হলো ষড়ঋতুর চতুর্থ ঋতু, এবং কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস হেমন্তকাল। শরৎকালের পর এই ঋতুর আগমন। শরৎ বিদায়ের পর হালকা কুয়াশার চাদর গায়ে দিয়ে নীরবে আসে। এর পরে আসে শীত। তাই হেমন্তকে শীতের পূর্বাভাস বলা হয়। হেমন্তকে শান্ত, স্নিগ্ধ ও মধুর মাসও বলা হয়। হেমন্তের ছোঁয়ায় প্রকৃতি ও মানুষ এক নতুন প্রাণ পায়। আকাশে, বাতাসে, বৃক্ষে, চরাচরে ছড়িয়ে পড়ে হেমন্তের সুন্দর রূপবিভা। হেমন্ত বাংলার মানুষের মধ্যে এক অদ্ভুত রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এর কল্যাণ স্পর্শে রাশি রাশি সোনায় ভরে ওঠে ফসলের মাঠ। এ সময় মাঠে মাঠে কৃষকেরা মেতে ওঠে ধান কাটার উৎসবে। ঘরে ঘরে ওঠে সোনার ফসল। পরিপূর্ণ হয় কৃষকের গোলা। ধান মাড়াই আর ভানার গানে মুখরিত হয়ে ওঠে গ্রামবাংলা। হেমন্ত মানে ফসলের সওগাত, নবান্নের উৎসব। এ আনন্দের সাথে পাল্লা দিয়ে ফোটে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি আর কামিনী। দিঘির জলে, বিলে-ঝিলে ফোটে নানা রঙের পদ্ম। এ সময় নদীর তীরে কাশফুলের অমল ধবল শোভা দেখে মন ভরে যায়। ষড়ঋতুর মধ্যে হেমন্ত আসলেই একটি চমৎকার ঋতু, অনুভবের ঋতু।

হেমন্তে গ্রামবাংলার যে সৌন্দর্য দেখা যায় তা অন্য ঋতুতে দেখা যায় না। গ্রামে সকালবেলা গাছের ডালে পাতায় পাতায়, ঘাসের ডগায়, ফুলের পাপড়িতে একেকটি শিশিরের ফোঁটা কী অপরূপ ঝলসায় সোনালি রোদে। ধান কাটা শূন্য মাঠে রাতের যাত্রাপালা আর দিনভর নানা কারুপণ্যের মেলা আজও মন কেড়ে নেয়। কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে নদনদী। গ্রামে গ্রামে ধুম পড়ে যায় খেজুর রসের পিঠা আর সিন্নি বানানোর অঘোষিত প্রতিযোগিতা। ছেলেমেয়েদের কলকাকলি আর ধান মাড়াইয়ের শব্দে জেগে ওঠে সমস্ত পাড়া গাঁ। হাটুরে হাটে যায়। দুধওয়ালা দুধে ভরা কলসি নিয়ে ছোটে গ্রামের সাপ্তাহিক হাটে অথবা গ্রাম পেরিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে। নৌপথে নববধূ চলে নাইওরে। তার দুচোখে ভাসে ফেলে আসা দিনগুলো, দুরন্ত শৈশব, কৈশোর আর আগামীর স্বপ্ন। মাঝে মাঝে গান গেয়ে চলে মাঝি। সব মিলে একটা ভালোলাগা দোল দিয়ে যায় হেমন্ত ঋতু গ্রামীণ জনপদে।

হেমন্ত বাংলার এক অনন্য ঋতু। কৃষকের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বর্ণালি ধান উপহার দেয় হেমন্ত। কৃষকের মুখে থাকে অনাবিল জীবন জাগানিয়া হাসি। কিষানির মুখে নতুন স্বপ্নের আহ্বান। সারা বছরের ধান গোলায় ওঠানোর আনন্দে উৎসাহিত কিষানিরা। সারারাত ধান ভানতে ভানতে কিষানিরা হাসিঠাট্টার মধ্যে পরস্পরের সুখ-দুঃখ বিনিময় করে। অভাব-অনটনে থাকা কৃষকের ঘরে বয় আনন্দের বন্যা। কিষানির পরণে নতুন শাড়ি, ঝলমলে থাকে হাসিমুখ। ছেলেমেয়েদের জন্য কেনা হয় নতুন জামাকাপড়, বাড়ির কর্তাদের জন্য নতুন লুঙ্গি, ফতুয়া, পাঞ্জাবি এবং ধুতি। ফসল বিক্রির টাকায় বিয়েশাদির ধুম পড়ে যায় ঘরে ঘরে। সারা বছরের স্বপ্ন এ সময় বাস্তবে রূপ নেয়। বেঁচে থাকার নতুন স্বপ্ন দেখায়। তাইতো কৃষিজীবী মানুষের দারিদ্র্য ঘোচানো এবং মঙ্গা ঘোচানো ঋতুর নাম হেমন্ত।

হেমন্ত যেন উৎসব আর পূজার সময়। কার্তিক পূজা, বুড়াবুড়ির পূজা, শনি পূজা, ভাইফোঁটা উৎসব, রাখিবন্ধন, মনসা পূজা, দুর্গা পূজা,

ধান কেটে ঘরে তোলায় ব্যস্ত কৃষক

নবান্ন উৎসবে শিল্পীদের পরিবেশনা

কালি পূজা ইত্যাদি পূজাসহ নানা ধরনের মেলা, ওরস, ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এর সাথে যোগ হয় বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ মেলা।

হেমন্তের মূল উৎসব নবান্ন। নবান্ন আর হেমন্ত যেন এক জোড়া শব্দ। নবান্ন শব্দের অর্থ নতুন অন্ন। মূলত নবান্ন ঋতুকেন্দ্রিক এক মহা উৎসব। অগ্রহায়ণ মাসে এ উৎসব পালন করা হয়। হেমন্তে ধান কাটার পর নতুন ধানের অন্ন খাওয়ার উৎসবই নবান্ন। নতুন আমন ধানের চাল দিয়ে ভাত রান্না হয়। নতুন চালের গন্ধে মৌ মৌ করে চারপাশ। তার সাথে সবজি ও রুই-কাতলা মাছ রান্না হয়। নতুন চালের ক্ষীর, পায়েস এবং পিঠাপুলির আয়োজনও থাকে এ সময়। কিষান বধূরা নজরকাড়া এবং নকশাসমৃদ্ধ পিঠা তৈরি করে এবং এর মধ্যদিয়ে তাদের জীবনের অলিখিত দুঃখ, যাতনা-বেদনার গল্প তৈরি হয়। এ সময় মেয়েরা নাইওর আসে বাপের বাড়িতে এবং জামাইকে দাওয়াত করে খাওয়ানো হয়। ছেলেমেয়েরা দলবেঁধে এ বাড়ি-ও বাড়ি ঘোরাফেরা করে এবং বনভোজনে মেতে ওঠে। এ উৎসব শুধু গ্রামেই নয়, শহরেও পালন করা হয়। রাজধানীর চারুকলায় এর প্রভাব অনেক। প্রতিবছর চারুকলায় নবান্ন উৎসব পালন করা হয় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করেও আয়োজন করা হয় বিভিন্ন মেলার। এসব মেলায় কি-না পাওয়া যায়। রকমারি খাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এবং আসবাবপত্রও পাওয়া যায় মেলায়। এ উৎসবের একটি সাংস্কৃতিক রূপও আছে। পালাগান, যাত্রা, গাজীর গীত, লাঠিখেলা, বাউল গান ইত্যাদির আয়োজনও করা হয়। বিদেশেও উদ্‌যাপন করা হয় এই নবান্ন উৎসব। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ভারত, চীন, জাপান, রাশিয়া এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের দেশেও নিজ নিজ দেশীয় ঐতিহ্য ও আচারের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয় এ উৎসব। শত শত বছরের ঐতিহ্যের পরম্পরায় হেমন্তের নবান্ন উৎসব বাঙালি জীবনের সবচেয়ে বড়ো অসাম্প্রদায়িক উৎসব– প্রাচীনতম উৎসব।

হেমন্ত আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও নানা মাত্রায় পল্লবিত করেছে। শিল্প-সাহিত্য, কবিতা, গল্প-উপন্যাস, চিত্রকলায় পড়ে হেমন্তের প্রভাব। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল প্রমুখ হেমন্তকে বর্ণনা করেছেন নানাভাবে–

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হেমন্তের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন–

'ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি'।

কাজী নজরুল ইসলাম 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায় হেমন্তের এক মনোহর ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন এভাবে–

'হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত
কিরণ ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য-আলো-সরিৎ।
দিগন্ত যেন তুর্কী কুমারী।
কুয়াশা নেকাব রেখেছে উতারী।
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিমি জাগিছে একা নিশিথ
নতুন পথ চেয়ে চেয়ে হরিৎ পাতার পীত।'

জীবনানন্দ দাশ হেমন্তের চিত্রপট এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। লিখেছেন–

'যখন হেমন্ত আসে গৌড় বাংলায়
কার্তিকের অপরাহ্নে হিজলের পাতা শাদা উঠোনের গায়
ঝরে পড়ে পুকুরের ক্লান্ত জল
ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, হিম হয়ে পড়ে গেছে ঝরে।'

কবি সুফিয়া কামাল অনেক কবিতায় হেমন্তের ছবি এঁকেছেন। তিনি লিখেছেন–

'রিক্তের অঞ্চল ভরি, হাসি ভরি ক্ষুধার্তের মুখে
ভবিষ্য সুখের আশা ভরে দিল কৃষকের বুকে।'

পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন তাঁর কাব্যে গ্রামবাংলার হেমন্তকে বরণ করেছেন এভাবে–

'অর্ধেক রাত উঠোনেতে হয় ধানের মলন মলা,
বনের পশুরা মানুষের কাজে মিশায় গলায় গলা।'

এভাবে হেমন্তের প্রকৃত রূপ কিংবা বিরূপ ধরা পড়েছে আমাদের সাহিত্যে। হেমন্ত তার রূপ মাধুর্য দিয়ে বাংলার সৃষ্টি সম্ভারকে করেছে আলোকিত। এই আলো বাঙালির চলার পথের পাথেয়। হেমন্ত কন্যা প্রতি বছর আসুক ঘরগেরস্তালিতে। ধানে, গানে আর উৎসবে মুখরিত হোক বাংলার সকল আয়োজন।

লেখক : সিনিয়র সাবএডিটর, সচিত্র বাংলাদেশ

ঋতুকন্যা হেমন্ত সেকাল-একাল

বরুণ দাস

হেমন্তের রৌদ্রের মতন / এক ক্ষেত ছাড়ি / অন্য ক্ষেতে
চলিব কি ভেসে / এ সবুজের দেশে
আর একবার / শুনিব কি গান
ঢেউদের! – জলের অঘ্রাণ / লব বুকে তুলে ॥

প্রতিদিন দিগন্তে সূর্যাস্তের সমারোহ, গোধূলির অপরূপ সোনালি আভা, বৃক্ষের পাতাঝরা দুপুরের নরম রোদ, মিষ্টি রঙের বিকেল, রাতের শেষে টিনের চালে পড়া শিশিরের শব্দ– এ সবই হচ্ছে হেমন্তের রূপ। হেমন্ত ঋতু নীরবেই আসে ঘাসের বুকে শিশিরের ফোঁটা আর শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে। বাংলার জনপদ জেগে ওঠে হেমন্তের ফসলের আমেজে। অবশ্য জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সেই রূপ এখন আর তেমন করে চোখে পড়ে না আমাদের।

সত্যি কথা বলতে কী, হেমন্ত এমন এক ঋতু, যাকে ভালো করে বোঝার আগেই হারিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে। চারদিকে ছড়িয়ে থাকা শরতের নীলাকাশ হারিয়ে যেতে থাকে। মনের ভেতর জায়গা করে নেয় অন্যরকম এক আবেগ। সোনাবরণ হৃদয় হরণ / ফসল জোড়া প্রান্তরে, খুশির কপাট দিচ্ছে মেলে / কিষাণ চাষির অন্তরে। হেমন্ত যে মায়ের হাসি / ছড়িয়ে যায় বুক জুড়ে, ডাক দিয়ে যায় ভাবনা রেখে / আয় কে নিবি সুখ মুড়ে? ফসল জোড়া প্রান্তরে কবির এই সুখ বন্দনা তাঁর একার নয়; এই সুখচিত্র আমাদের সবার অন্তরের।

একটিবার কল্পনায় যদি ভেবে দেখি– দিগন্তজোড়া সোনালি ধানে ভরা মাঠ। যতদূর চোখ যায় ততদূরই শুধু ধান আর ধান। ধানের পিঠে শুয়ে আছে সোনা রং মাখা আদুরে রোদ। কী তার কোমলতা, সীমাহীন মায়াবী। এমন সৌন্দর্যময় দৃশ্যে আমাদের চোখ যেমন পরিতৃপ্ত হয়; পাশাপাশি কোমল স্নিগ্ধতার সৌরভে ভরে যায় মন। অবশ্য শহরে বসে এমন দৃশ্য কেবল কল্পনাতেই সম্ভব। কিন্তু আমাদের চিরায়ত গ্রামের পটভূমি কিন্তু এই সময়ে ঠিক এরকমই।

অনেককাল আগে থেকেই আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে কৃষিকে কেন্দ্র করে। তাই কৃষি নিয়েই আমাদের জীবন। নবান্ন উৎসব আসলে কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় প্রধান শস্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে পালন করা হয়। আজ আমরা যারা শহুরে তাদের সবার শেকড় কিন্তু সেই গ্রামেই। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পরিবেশের ক্রমাগত পরিবর্তন আমাদের আবহাওয়ায় যে বদল নিয়ে আসছে তাতে ঋতুর বৈশিষ্ট্যগত বেশ তারতম্য দেখা গেলেও আমরা মেতে উঠি হেমন্ত বন্দনায়।

হেমন্ত এসে গেছে...

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে হেমন্ত হচ্ছে চার নম্বর ঋতু। হেমন্ত নানা দিক দিয়েই বাংলার এক অনন্য ঋতু। পৃথিবীর আর কোথাও এই অনুভূতি নিয়ে হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব হয় কিনা সন্দেহ রয়েছে। কারণ হেমন্ত আমাদের জীবনে নিয়ে আসে আশার বাণী। সোনালি ধানে ভরে ওঠে বাংলার বুক। সেই সাথে কুয়াশা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে মাঠ-ঘাট। শিশিরের ছোঁয়া পেয়ে পাকা ধান ঝিলমিল করে ওঠে। আর তাই অন্যসব ঋতু থেকে বাংলাদেশের এই সময়টা এক অসাধারণ ঋতুর গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শিশিরস্নাত সকাল, সোনামাখা রোদ, স্নিগ্ধ-সৌম্য দুপুর, পাখির কলতানে ভরা সন্ধ্যা আর মেঘমুক্ত আকাশে জ্যোৎস্না ডুবানো আলোকিত রাত হেমন্তকে করে তোলে আরো রহস্যময়। সেইসাথে এই রহস্য প্রকৃতিতে এনে দেয় ভিন্নমাত্রা। হেমন্তের এই মৌনতাকে

রাশি রাশি সোনায় ভরে উঠেছে ফসলের মাঠ

ছাপিয়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে নবান্ন প্রবেশ করে জাগরণের গান হয়ে, মানুষের জীবনে এনে দেয় উৎসবের ছোয়া। নবান্ন মানেই চারদিকে পাকা ধানের মৌ মৌ গন্ধ, নতুন অন্ন, গ্রামের মাঠে মাঠে চলে ধান কাটার ধুম, হেমন্তে এই ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। গৃহস্থ বাড়িতে নতুন ধানে তৈরি পিঠাপুলির সুগন্ধ বাতাসে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। গ্রামীণ সংস্কৃতিতে হেমন্তের এ শাশ্বত রূপ ছিল চিরকালীন। এই রূপ এখনো পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়নি; তবে ধীরে ধীরে এর রং আর রস তার আসল সৌন্দর্য যেন হারাতে বসেছে।

হেমন্ত দিয়েই ছিল বছর শুরু

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ– এ দুই মাসকে আমরা হেমন্তকাল হিসেবে জানি। কিন্তু একটি সময় ছিল যখন বাংলায় বছর শুরু হতো হেমন্ত দিয়ে। সম্রাট আকবর বাংলা পঞ্জিকা তৈরি করার সময় অগ্রহায়ণ মাসকেই বছরের প্রথম মাস বা খাজনা আদায়ের মাস হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। 'অগ্র' এবং 'হায়ণ'–এ দুই অংশের অর্থ যথাক্রমে 'ধান' ও 'কাটার মৌসুম'। বর্ষার শেষদিকে বোনা আমন-আউশ শরতে বেড়ে ওঠে। আর হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে তা পরিপক্ক হয়। অগ্রহায়ণে ফসল ঘরে তোলা হয়। বলা হয়ে থাকে, মরা কার্তিকের পর আসে সর্বজনীন লৌকিক উৎসব নবান্ন।

হেমন্তের ফসল কাটাকে কেন্দ্র করেই নবান্ন উৎসবের সূচনা হয়। নবান্ন মানে নতুন অন্ন। বাংলার ঐতিহ্যবাহী শস্যোৎসব। নতুন আমন ধান কাটার পর সেই ধান থেকে প্রস্তুত চালের প্রথম রান্না উপলক্ষে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ফসল তোলার পরদিনই নতুন ধানের নতুন চালের ফিরনি-পায়েস অথবা ক্ষীর তৈরি করে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়। নবান্নের উৎসবে আয়োজন করা হয় আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। লাঠিখেলা, বাউল গান, নাগরদোলা, শখের চুড়ি, খৈ, মোয়ার পসরা ইত্যাদি বসে গ্রাম্য মেলায়। কিন্তু কালের ধুলোয় এসব কিছুই ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রয়োজন এসব ঐতিহ্যকে ধরে রাখার, নতুন প্রজন্মকে চিনিয়ে দেবার।

হেমন্ত কেবল অনুভবে

মজার বিষয় হলো– শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষার মতো হেমন্ত কিন্তু তীব্র, প্রখর অথবা মুখরা কোনোটিই নয়; তাই হেমন্তকে আলাদা করে দেখা যায় না, এটি কেবলমাত্র অনুভবের বিষয়। বসন্তে তীব্র ফুলের গন্ধ, পাখির গান অথবা গ্রীষ্মের খরতাপ, বৈশাখি ঝড় কিংবা বর্ষায় ভরা নদীনালা, ঘনঘোর বর্ষায় দিনব্যাপী ঝমঝম বৃষ্টির মতো করে হেমন্ত জানান দেয় না আমি এসে গেছি বলে। যদিও হেমন্তে থাকে না পাখির গুঞ্জন, বর্ষার রিমঝিম শব্দ, কোকিলের কুহু কুহু গান। চোখ জুড়ানো মন মাতানো ফুলের বাহার না থাকলেও ফুলের সৌরভে সুরভিত হয় হেমন্তের দিনগুলো। এ ঋতুতে ফোটে গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, শাপলা, পদ্ম, কামিনী, হিমঝুরিসহ নাম না-জানা হরেক রকম ফুল। বসন্তকে বলা হয় ঋতুর রাজা। বিপরীতে হেমন্তই কিন্তু ঋতুর রাণি। এককালের গ্রামবাংলায় হেমন্তই ছিল উৎসব আনন্দের প্রধান মৌসুম। ঘরে ঘরে ফসল তোলার আনন্দ আর ধান ভানার গান ভেসে বেড়াতো বাতাসে। ঢেঁকির তালে মুখর হতো বাড়ির আঙিনা। এখন তো প্রযুক্তির কল্যাণে নানা যন্ত্রপাতির আবির্ভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে এসব। সেইসাথে দ্রুত বদলে যাওয়া জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটছে দিকে দিকে তাতে করে এসব ঐতিহ্যকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না।

কাব্য বন্দনায় হেমন্ত

হেমন্ত যতই ধূসর আর বিবর্ণ হোক না কেন, বাঙালির অস্তিত্বের সাথে, শেকড়ের সাথে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে এ ঋতু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শরতের শুভ্রতা শেষে নিরিবিলি হেমন্তের আগমন ঘটে প্রকৃতিতে। যেন মৃত্যুর পরও এমন অপরূপ দেশে খুঁজে নিতে ইচ্ছে হয় সমগ্র পৃথিবীর রূপ। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য তখন হেমন্তের গান গেয়ে খেলা করে মানবহৃদয়ে। ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষার মাত্রা তখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। তাই কবিকণ্ঠে তখন শোনা যায় অন্য এক আকুতি:

কামিনী ফুল

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলায়

হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে,

হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে

কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়

[আবার আসিব ফিরে: জীবনানন্দ দাশ]

হেমন্তের মল্লিকা বনে লেগেছে রং

ধূসর পাণ্ডুলিপির কবি জীবনানন্দ দাশ যথার্থই বলেছেন। মৃত্যুর পর আবার তিনি এই বাংলায় ফিরে আসতে চান। আর মৃত্যু পরবর্তী তিনি হেমন্তের অর্থাৎ কার্তিকের নবান্নের দেশেই ফিরে আসার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিখ্যাত কবিতার চরণে চরণে।

ঋতুচক্রের আবর্তে আশ্বিন-কার্তিক দুই মাস হেমন্তকাল। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর গানে হেমন্তকালকে বরণ করেছেন অন্যভাবে। তিনি গাইলেন– 'হিমের রাতে এই গগনে দ্বীপগুলোরে হেমন্তিকা করলো গোপন, আঁচল ঘিরে ঘিরে/ ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো দীপালিকায় জ্বালাও আলো/ জ্বালাও আলো/ আপন আলো সাজাও আলো ধরিত্রীরে'। আবার অন্যত্র লিখেছেন– 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া / আমি দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া'।

প্রকৃতির কবি নির্জনতার কবি জীবনানন্দ দাশ তো হেমন্তকে নতুন অনুষঙ্গে সাজিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর অনেক কবিতাই হেমন্তকালকে নিয়ে লেখা। এমনকি 'বনলতা সেন' কবিতায়ও কবি অত্যন্ত নিপুণতার সাথে হেমন্তের যথার্থ চিত্র এঁকেছেন। 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যা নামে/ ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল/ পৃথিবীর সব রং মুছে গেলে পান্ডুলিপি করে আয়োজন / তখন গল্পের তরে জোনাকির রং ঝিলিমিল/ সব পাখি ঘরে আসে/ সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন/ থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে হেমন্ত এক অপরূপা সুন্দরী। ঋতুকন্যা হৈমন্তীর প্রেমে হাবুডুবু খায় পুরো প্রকৃতি। কবির চোখে– 'প্রথম ফসল গেছে ঘরে/ হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে শুধু শিশিরের জল;/ অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে/ হিম হয়ে আসে/ বাঁশপাতা-মরা ঘাস-আকাশের তারা!' কবির কবিতায় হেমন্ত, প্রকৃতি আর আত্মমগ্ন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। ফলন্ত ধানের ঋতু হেমন্তের গাথা বাংলা কবিতায় একরকম ব্যতিক্রম বললেই চলে। শুধু কি দৃশ্যের? গন্ধের, শস্যের, আলস্য-পূর্ণতা-বিষাদের করুণতামাখা লাবণ্যময়ী ঋতু হেমন্ত।

বাংলা কবিতার বিপুল ভাণ্ডার থেকে তুলে আনা পঙ্‌ক্তিমালা পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, হেমন্তকে কবিতার ঋতু করে তুলেছেন একান্তভাবে জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতায় ধান কাটা, নবান্ন, ইঁদুর, শালিক, লক্ষ্মীপেঁচা, নির্জন স্বাক্ষর, কার্তিকের নীল কুয়াশা প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ হেমন্তের চিত্র এমনভাবে তুলে ধরে যে, জীবনানন্দ পাঠ করলে পুরো হেমন্তের চিত্রই যেন ফুটে ওঠে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

হেমন্তের শেষদিকে দূর দেশ থেকে দল বেঁধে ছুটে আসে অতিথি পাখি। শীত বা তুষারপ্রবণ অঞ্চল থেকে এসব পাখি ছুটে আসতে শুরু করে আমাদের দেশে কিছুটা উষ্ণতার আশায়। এক শ্রেণির পাখি শিকারি এসব অতিথি পাখি শিকারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাখি বিক্রি করতে দেখা যায় তাদের। এই দৃশ্যেরও অবলুপ্তি দরকার। কারণ এরাও প্রকৃতিতে প্রভাব রাখছে। এভাবে এদের নিধন করা হলে তা বিরূপ আবহ তৈরি করবে।

হেমন্তের শেষদিকে এসব দৃশ্য দেখেই শীতের আগমনী বার্তা টের পাওয়া যায়। তাই হেমন্তকে বলা হয় শীতের পূর্বাভাস। হেমন্তকে বিদায় জানানোর পর কনকনে ঠাণ্ডা শীতের তীব্রতায় টের পাওয়া যায় হেমন্তের আবহাওয়া কত মনোরম। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি সারাবছরই হেমন্তকাল হতো! গরমও না, ঠাণ্ডাও না এমনকি বৃষ্টিও না!

তবে এসব এখন আর আক্ষরিক অর্থেই আর ঘটছে না। সবকিছু বদলে যাচ্ছে, যে সময়ের যা তা আর হচ্ছে না বা সময়ের পরে হচ্ছে কিংবা আগে হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে বিগত কয়েক বছর ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ষড়ঋতুর মধ্যে মাত্র চারটি ঋতুর উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। বাকি দুটি ঋতু হেমন্ত আর বসন্ত প্রকৃতি থেকে প্রায় যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রকৃতির এই বৈরিতা মেনেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সামনের দিকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবমুক্ত হয়ে টিকে থাকতে হবে আমাদের।

লেখক : মিডিয়াকর্মী ও প্রাবন্ধিক

ব্লু হোয়েল শুধু নয় যে-কোনো আসক্তিই ক্ষতিকর

মো. সালাহউদ্দীন

বাংলাদেশে সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটভিত্তিক ব্লু হোয়েল গেম আতঙ্ক। ফেসবুক, পত্রপত্রিকা, টেলিভিশনসহ সকল মাধ্যমেই থাকছে ব্লু হোয়েল নিয়ে খবর। বাবা-মা সন্তানকে, আত্মীয়-আত্মীয়কে, বন্ধু-বন্ধুকে, সামাজিক মাধ্যমে শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে যেভাবে পারছে ব্লু হোয়েল সম্পর্কে সচেতন করছে।

ব্লু হোয়েল একটি ইন্টারনেট ভিত্তিক গেম। একে সুইসাইড গেমও বলা হয়। এ গেমে একজন অ্যাডমিন নির্দেশনা দিয়ে থাকে। ৫০টি ধাপে এটি খেলতে হয়। চিহ্ন হিসেবে গেমারের হাত কেটে তিমি মাছের ছবি আঁকতে হয়। প্রথম ১৫ ধাপে খেলাটি বেশ মজার, যেমন– রাতে উঠে পড়তে বসা, ৪.২০ মিনিটে হরর মুভি দেখা, রেললাইনের ওপর হাঁটাহাঁটি করা, মোমবাতি নিয়ে ছাদে একা

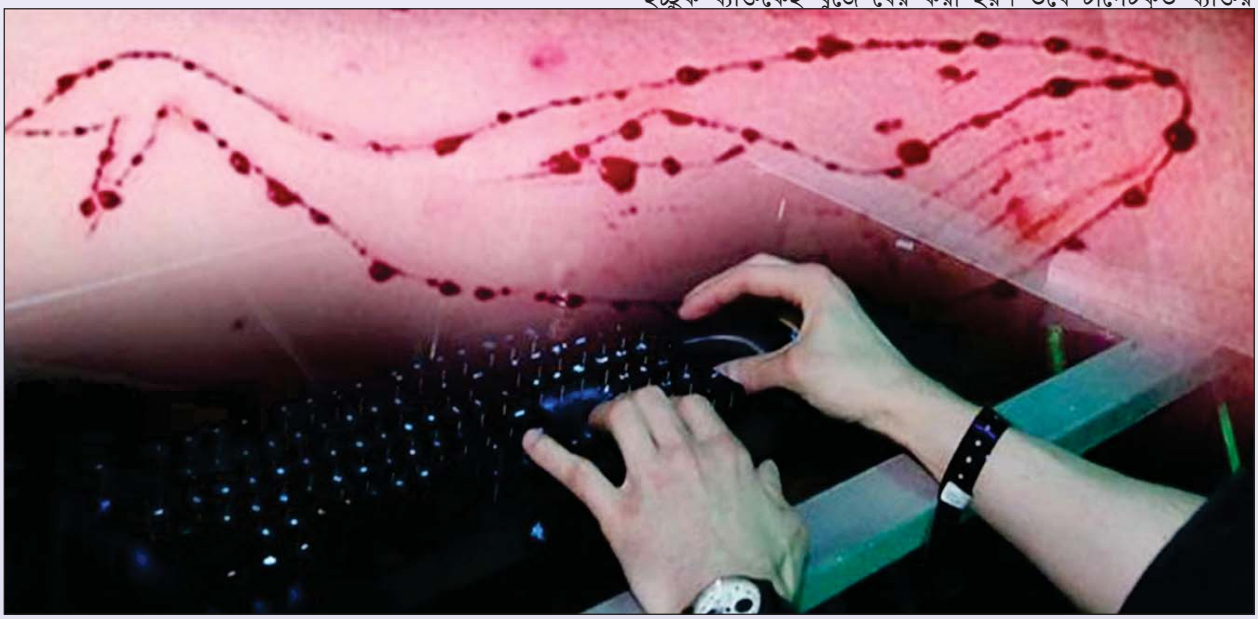

দাঁড়িয়ে থাকা, ছাদের রেলিং-এর ওপর হাঁটাহাঁটি করা ইত্যাদি। মজার মজার এসব টাস্কের ফাঁকে অ্যাডমিন হাতিয়ে নিতে থাকে গেমারের সব তথ্য। তাদের পাঠানো গান দ্বারা গেমারকে মোহিত করা হয়। ক্রমে ক্রমে তাকে দিয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর ধাপ খেলানো হয়। এভাবে ধীরে ধীরে তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। এক পর্যায়ে তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়।

এ গেম খেলে ইতিপূর্বে রাশিয়ায় মৃত্যুবরণ করে ১৫০ জন। অন্যান্য দেশে ৫০ জন মারা গেছে বলে জানা যায়। রাশিয়ার এক মনোবিদ্যার শিক্ষার্থী ফিলিপ বুদেকিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্ত হওয়ায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে ২০১৩ সালে 'এফ ৫৭' নামে এ গেমটি তৈরি করে। তার মতে, যারা হতাশাগ্রস্ত, সমাজে যারা কোনো ভূমিকা রাখে না তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। ২০১৫ সালে ১৭ জনকে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করায় তার তিন বছরের জেল হয়।

বিশ্বের বাইরে এ গেমটি আগে থেকে খেলা হলেও বাংলাদেশে এ আতঙ্ক নতুন। দুয়েক জন কিশোর-কিশোরীর ব্লু হোয়েলে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লেও পরে তা ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে। ব্লু হোয়েল গেমে বাংলাদেশে আত্মহত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বিটিআরসিকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেন, এর ধারাবাহিকতায় বিটিআরসি বিজ্ঞপ্তি দেয় ইন্টারনেটে ব্লু হোয়েল কিংবা এর মতো জীবনবিনাশী কোনো গেমের তথ্য পেলে ২৮৭২ নম্বরে ফোন করে তা জানাতে।

দেশের ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে ব্লু হোয়েল গেমের আদৌ কোনো অস্তিত্ব আছে কি-না তা নিয়ে সন্দেহ থাকলেও সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন গেম নির্মাতা ও তথ্য প্রযুক্তিবিদরা। বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ব্লু হোয়েল গেমের কোনো অস্তিত্ব নেই। তবে কেউ যেন এ ব্যাপারে অত্যুৎসাহী হয়ে না ওঠে।

ব্লু হোয়েলের সফটওয়্যার অনেক আগেই ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটি এখন ডার্ক ওয়েবের গেম। ফলে সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের আক্রান্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। গেম সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্লু হোয়েল কোনো মোবাইলভিত্তিক গেম নয়। পিসিতে ডার্ক ওয়েব ব্যবহারে সক্ষম এমন ব্যক্তিরাই গেমটি খেলতে পারবে। তাদের মতে, গেমটিতে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই টার্গেট করা হয়। এ ক্ষেত্রে হতাশাগ্রস্ত ও কেবলমাত্র আত্মহত্যায় ইচ্ছুক ব্যক্তিকেই খুঁজে বের করা হয়। তবে টার্গেটিকত ব্যক্তির সম্মতি না থাকলে তিনি মুক্তি পাবেন এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে।

বেসিস সভাপতি ও বিশিষ্ট তথ্য প্রযুক্তিবিদ মোস্তফা জব্বারের মতে, আর্থসামাজিক অবস্থার কারণে ব্লু হোয়েল দেশে আত্মহত্যার মতো মড়ক তৈরি করবে না। তবে গেমটি সম্পর্কে অভিভাবক ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে অধিকতর সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এদিকে ইন্টারনেটের 'গেটওয়ে' নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ব্লু হোয়েলের মতো আত্মহত্যায় প্রলুব্ধকারী সব গেমের লিংক ৬ মাসের জন্য সবার নাগালের বাইরে রাখতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ব্লু হোয়েল আশঙ্কামুক্ত–তবে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে নিজ নিজ সন্তানদের প্রতি। মনে রাখতে হবে, শুধু ব্লু হোয়েল নয় সব রকম আসক্তিই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আশার পথে অন্তরায়।

প্রতিবেদন : তথ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়

হুমায়ূন আহমেদের ছোটোগল্পের ভুবন

বাঙালি মধ্যবিত্তের দর্পণ

রেবেকা শারা

হুমায়ূন আহমেদকে বলা হয় বর্তমান কথাসাহিত্যের রাজপুত্র। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ও শক্তিশালী লেখক। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমাদের কথাসাহিত্যে যে ক'জন শক্তিমান লেখক তাঁদের লেখা দিয়ে এই পরিমণ্ডলকে বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌছে গেছেন হুমায়ূন আহমেদ। *শঙ্খনীল কারাগার* ও *নন্দিত নরকে* খ্যাত হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে সাহিত্য সমালোচকরা বলছেন, বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ এক বিস্ময়কর নাম, এক জাদুমাখা নাম। তিনি জানেন কীভাবে গল্প লিখতে হয়, কীভাবে গল্পকে গল্প করে তুলতে হয়। সাধারণত সব লেখক এই দুরূহ, একইসঙ্গে কঠিন কাজটি ঠিকমতো করতে পারেন না। তবে হুমায়ূন আহমেদ এক্ষেত্রে অনন্য মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে বাংলা ছোটোগল্পে তিনি নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করেছেন তাঁর অসাধারন সব ছোটোগল্প দিয়ে। সাহিত্য সমালোচকরা হুমায়ূন আহমেদের নানা সীমাবদ্ধতার কথা বললেও তাঁর ছোটোগল্প নিয়ে কোনো সংশয় নেই তাদের। পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদ সমান তালে তাঁর উপন্যাস দিয়েও দেশ-বিদেশের পাঠককে বই পড়ার প্রতি হারানো আগ্রহটা নতুন করে ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন- এখানেই তাঁর সাফল্য। শুধু কি ছোটোগল্প? উপন্যাসের পাশাপাশি হুমায়ূন আহমেদ নাটক, শিশুতোষ সাহিত্য, রম্য, ফিকশন, অতিপ্রাকৃত রচনা, স্মৃতিকথা, প্রবন্ধ , চলচ্চিত্র– সাহিত্যের সব শাখায়ই স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেছেন এবং নিজের মুন্সিয়ানাও দেখিয়েছেন।

সাহিত্যের পাঠকরা বলছেন, হুমায়ূন আহমেদের গদ্যের সরল ভঙ্গি পাঠককে মুগ্ধ করে। পাঠকের সঙ্গে সহজবোধ্য ভাষায় তিনি যোগাযোগ গড়ে তোলেন। এই লেখক গল্প লেখা কিংবা বলার সময় একটা পদ্ধতি অনুসরণ করেন যা গল্পের পাঠককে বাধ্য করে তাঁর সঙ্গে হেঁটে যেতে। আর একজন পাঠক যখন লেখকের সঙ্গে তাঁর রচনা পড়ে হাঁটতে থাকেন তখনই প্রকাশিত হয় লেখকের সার্থকতা। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর গল্পের ভেতর যে মুন্সিয়ানা দেখান বরাবরই সেটা হলো, গল্পের চমকপ্রদ অংশ তিনি অনুচ্ছেদের শেষে বলেন। আর একগুচ্ছ চমক রহস্যের মতো করে জমাতে থাকেন, গল্পের শেষ দিকে বলবেন বলে। এতে পাঠকের পুরো গল্পটি পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়।

হুমায়ূন আহমেদের গল্পে আরেকটা বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় সেটা হলো, এই লেখক গল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চমকের প্রবণতা রাখেন। পাঠক একবার তাঁর লেখা পড়া শুরু করলে তাঁর পক্ষে লেখা শেষ না করে ওঠা কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আরও একটি প্রবণতা তাঁর গল্পে থাকে সেটা হলো, তিনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন ঘটনা পাঠককে শোনাতে চান, যা এর আগে পাঠক শোনেনি বা এমন ঘটনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় নেই। আবার কিছু গল্পে তিনি টেনে আনেন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা। যাকে বলে মেটা-ফিজিকস।

বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদের লেখার ভেতরে যেভাবে মধ্যবিত্তের জীবন উঠে এসেছে অতীতে আর কোনো লেখক এভাবে মধ্যবিত্তের সেই হাসি-কান্নার জীবনকে তুলে আনতে পারেননি। এক্ষেত্রে হুমায়ূন আহমেদ অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। পাঠকেরা তাই তাঁকে মধ্যবিত্ত সমাজের কারিগর বলে অভিহত করেছেন। সাহিত্য সমালোচকরা বলছেন, হুমায়ূন আহমেদের গল্পেই আমরা প্রথমবারের মতো মধ্যবিত্তকে পেলাম তাদের নিত্যদিনের সমস্যা-সংকট-আনন্দ-বেদনা-হাসি-কান্নাসহ। অল্প কথায়, সাবলীল ঢংয়ে জীবনের ছোটোখাটো সুখ-দুঃখগুলো তাঁর গল্পে চমৎকার কুশলতায় ধরা পড়েছে। বাংলাদেশের

মধ্যবিত্তের স্পর্শকাতর বিন্দুগুলোর সঙ্গে সাক্ষাত হয় তাঁর ছোটোগল্পে। মূলত, নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবন, তার বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির নিভৃত উন্মোচন ঘটেছে হুমায়ূন আহমেদের গল্পে। বাংলাদেশের ছোটোগল্পকারদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁর হিউমার সেন্স অদ্বিতীয়; তিনি জাতীয় জীবনের নানা ঘটনাকে বরাবরই ব্যঙ্গাত্মক রূপে প্রকাশ করার সক্ষমতা দেখিয়েছেন,

যেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে হাস্যরসময় বর্ণনাভঙ্গি। এই অন্যতম প্রবণতার কারণে বাংলাদেশের ছোটোগল্পের ভুবনে তিনি সফলমাত্রার গল্প যোগ করেছেন।

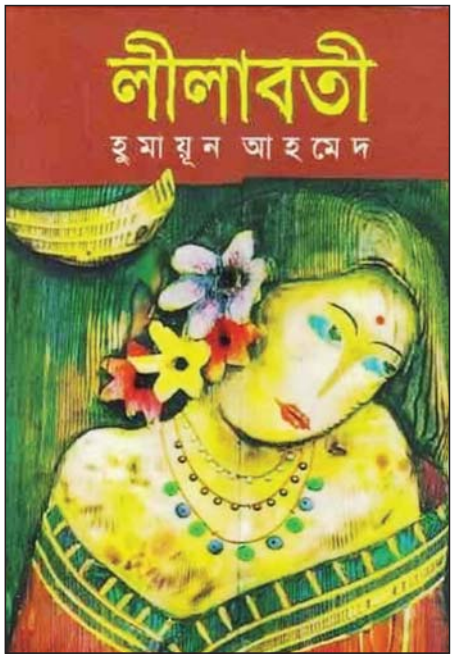

সাহিত্য সমালোচকগণের মতে, জীবনকে তিনি দেখেছেন সহজ ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে। জীবনের নানা ঘটনাকে, অভিজ্ঞতাকে তিনি এমন নিপুণতার সঙ্গে তাঁর গল্পে বর্ণনা করেছেন যে, পাঠকের কাছে তা অতি পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা বলে মনে হয়। মধ্যবিত্তের পরিবার কাঠামোর মধ্যে ঘটতে থাকা পিতার শাসন, মায়ের আদর, বোনের স্নেহ, মামার পাগলামি, ফুপির মৃত্যু, বাবার অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার জন্য নতুন পোশাক পরতে না পারার দুঃখ, ছোটোবোনের মৃত্যু, বিয়ের দিন বাড়ি থেকে উচ্ছেদ এবং শৈশব- কৈশোর-যৌবনের দিনগুলোকে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর গল্পে সহজভাবে চিত্রিত করতে পেরেছেন।

হুমায়ূন আহমেদের গল্প-উপন্যাস পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না এরকম কথা বেশ প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক ও গবেষক অভীক দত্ত তাঁর 'হুমায়ূন আহমেদের ছোটো গল্প এবং তার চরিত্রেরা' শীর্ষক এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, 'হুমায়ূন আহমেদের সাথে প্রথম পরিচয় আমার শারদীয়া 'দেশ' এর মাধ্যমে। ওনার *'নীল মানুষ'* উপন্যাসটি পড়ে বেশ চমকে গিয়েছিলাম। আসলে কখন যে শুরু করেছিলাম পড়তে আর কখন যে শেষ হয়ে গেছিল নিজেই বুঝতে পারি নি। হুমায়ূন আহমেদ পড়ার সময় এক অদ্ভুত আনন্দ পাই। তরতরিয়ে চলা নদীর মতো ভাষা, সহজ-সরল গদ্যে পাঠককে আকৃষ্ট করার এক অন্য রকম ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। ঠিক যে গদ্যের ভাষা টেনে রেখেছে ওনার পাঠকদের। অকারণ হেঁয়ালি নেই, ন্যাকামি নেই, টানটান পাঠ অভিজ্ঞতা।

তারপর থেকে যেটা আমি করলাম সেটা হলো পাগলের মতো হুমায়ূন আহমেদ পড়া শুরু করলাম। বাড়িতে বেশ কিছু বই ছিল,

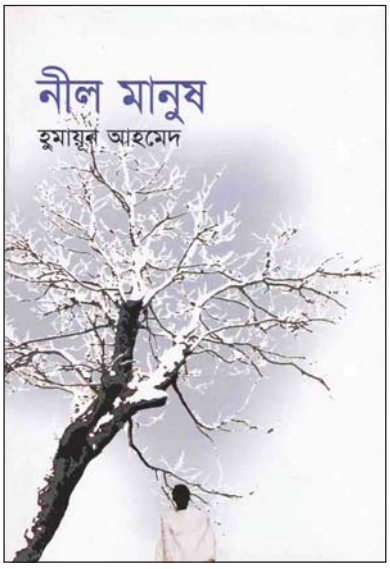

সেগুলি গোগ্রাসে শেষ হলো, তারপর কলকাতা বইমেলার জন্য শুরু হলো টাকা জমানো। দুটো দুটো করে সমগ্র কেনা, তারপর একে একে যেখানে যা লিখে ফেলেছেন তা গোগ্রাসে গিলে ফেলা।

প্রচুর লেখার ফলে কখনও একই প্রসঙ্গ ওনার অজান্তেই তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে, আশ্চর্যজনকভাবে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলনও পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু তিনি এমনভাবে পাঠককে তাঁর লেখার সাথে জড়িয়ে নিতে জানতেন যে পাঠক কখনোই সেটাকে খুঁজে বেড়ায়নি। বরং চেয়েছে আরও বেশি করে তাঁর লেখা পড়তে। এই সৌভাগ্য সব লেখকের হয় না, এ এক বিরল গুণ। হুমায়ূন আহমেদের লেখনী নিয়ে বিশেষ করে হিমু আর মিসির আলী নিয়ে লিখেছি এর আগে। আমার মনে হয় এবার ওনার ছোটোগল্প নিয়ে লেখা দরকার। এমন নির্লিপ্ত ভাবে, নিজের মতো পাঠকের উপর না চাপিয়ে, স্বল্প পরিসরে জাদু সৃষ্টি করা ছোটোগল্পগুলো এক অদ্ভুত আমেজ এনে দেয়। গল্পগুলি পড়ার পরেও মনে অনেকক্ষণ রেশ থেকে যায়।

তাঁর ছোটোগল্পগুলো তিনি শুরু করেছেন সাদা ক্যানভাসে খুব অবহেলাভরে, রঙ দিয়ে, যেন ইচ্ছা নেই, তারপর ধীরে ধীরে ছবিটা যত পরিষ্কার হচ্ছে, তত গল্পের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে পাঠক। গল্পের পটের বৈচিত্র্য অভাবনীয়। ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলোকে নিয়ে যে এমন সব গল্প লেখা যায় না পড়লে কে জানত!'

একই লেখায় তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, '...একই ভাবে গল্পের মধ্যে আদিভৌতিক এবং কল্পবিজ্ঞানের ব্যাপারস্যাপারও অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। *"পিঁপড়া"* গল্পটাই যেমন। ডাক্তার নূরুল আফসারের কাছে এক আজব রুগি আসে। সে নাকি যেখানেই যায় তাকে পিঁপড়া এসে ঘিরে ধরে। এই জ্বালায় সে কোথাও যেতে পারে না। বিভিন্ন পন্থাও সে আবিষ্কার করেছে পিঁপড়ে আটকাবার কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। সারা শরীরে গুঁড় মেখে বসেও ছিল একবার। তাতে নাকি পাঁচদিন কোনো পিঁপড়ে আসে নি। বিষে বিষক্ষয়। ছদিনের দিন থেকে আবার পিঁপড়ের জ্বালাতন শুরু হয়ে যায়। আরেকবার নদীর মাঝখানে নৌকা নিয়ে বসেছিল। তিনদিন গিয়ে চারদিনের দিন থেকে আবার নৌকাতেই পিঁপড়ে হানা দিল। আর এই গল্পের ভেতরে গল্প খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, রুগির চরিত্রের কদর্যতম দিকের কথা। খুব হালকা ভাবে গল্পটা শুনিয়েছেন গল্পকার অথচ পড়ার সময়ে গা শিউরে উঠবেই পাঠকের।

একইভাবে, *'অচিন বৃক্ষ'*, *'ওইজা বোর্ড'*, *'ভয়'*, *'জিন-কফিল'*, *'নিজাম সাহেবের ভূত'*, *'মৃত্যুগন্ধ'*, *'নিমধ্যমা'*, *'যন্ত্র'*, *'খেলা'*, *'পিঁপড়া'*, *'জীবন যাপন'*, *'খবিস'* ইত্যাদি গল্পে খুঁজে পাওয়া যাবে এক অদ্ভুত পট। প্রথম জীবনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় একা একা ঘুরে বেড়াতেন লেখক, এই গল্পগুলির কনসেপ্ট সম্ভবত সেই সময়েরই ফসল।'

হুমায়ূন আহমেদের ছোটোগল্পকে শিল্প বোদ্ধারা তুলনা করছেন বিশ্বসাহিত্যের ক্লাসিক গল্পগুলোর সঙ্গে। তারা বলছেন, সাহিত্য মূল্যের দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হুমায়ূন আহমেদের ছোটোগল্প সব দিক থেকেই বিশ্ব সাহিত্যের অন্যান্য গল্পের প্রায় সমকক্ষ। বাংলা ছোটোগল্পে তাঁর গল্প মধ্যবিত্ত বাঙালির আশা-দুঃখ-বেদনা-কান্নাকে যেভাবে, যে মাত্রায় তুলে ধরা হয়েছে তা তাঁর আগে কেউ পারেননি।

লেখক : প্রাবন্ধিক

খুলনা-কলকাতা ‘বন্ধন এক্সপ্রেস’ ট্রেন চালু

রেহানা শাহ্‌নাজ

৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে খুলনা ও কলকাতার মধ্যে ‘বন্ধন এক্সপ্রেস’ নামের ট্রেন সার্ভিস চালু করেন আনুষ্ঠানিকভাবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে চাই সহযোগিতার সম্পর্ক। দক্ষিণ এশিয়াকে একটি শান্তিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ভারত ও অন্যান্য নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাই। যাতে আমরা সুপ্রতিবেশী হিসেবে পাশাপাশি বাস এবং জনগণের কল্যাণ করতে পারি। আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বন্ধন শুধু রেলের বন্ধন নয়। আমাদের এই বন্ধন যেন দুই দেশের জনগণের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করে আর্থসামাজিক উন্নয়নের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেটাই আমাদের কাম্য। এ উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে প্রতিবেশী বন্ধুর মতো সম্পর্ক হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে যখনই ইচ্ছে হবে তখনই কথা বলব বা দেখা করব, সাক্ষাৎ করব। সাক্ষাৎ বা দেখা করার বিষয়টি প্রটোকলের মধ্যে থাকা উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে এবং নরেন্দ্র মোদি নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সবুজ পতাকা নেড়ে এই ট্রেন সার্ভিস উদ্‌বোধন করেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন।

একই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয় ভৈরব রেল সেতু ও তিতাস রেল সেতু উদ্‌বোধন করেন। পাক-ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন আমলে বর্তমান বাংলাদেশে প্রথম ট্রেন চালু হয় ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর। সর্বপ্রথম কুষ্টিয়ার জগতী থেকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পর্যন্ত ৫৩ দশমিক ১১ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন সেসময় চালু হয়। ২৩ বছর পর ১৮৮৫ সালে ময়মনসিংহ - ঢাকা- নারায়ণগঞ্জ রেললাইন চালু করা হয়। প্রথমে কাঁচাপাট কলকাতায় সহজে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ট্রেনের এই লাইন চালু হয়। ১৮৯৫ সালে আসাম-বাংলা রেলের আওতায় চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত ১৫০ দশমিক ৮৯ কিলোমিটার মিটারগেজ লাইন চালু হয়। একই বছরে কুমিল্লা - লাকসাম- চাঁদপুর ট্রেন লাইন চালু হয়। ভৈরববাজার থেকে গৌরিপুর জং-এ ট্রেন চালু হয় ১৮৯৮ সালে। সেসময় এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বন্ধুত্বকে জনগণের বন্ধনে পরিণত করার ক্ষেত্রে রেল যোগাযোগের উপযোগিতা ছিল অপরিহার্য।

অর্ধশতাব্দীর পর আবারো চালু হলো খুলনা-কলকাতা রেল চলাচল। ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পরও চালু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৯ নভেম্বর ২০১৭ যৌথভাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ অর্থায়নে নির্মিত ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস রেল সেতু, খুলনা-কলকাতা ট্রেন 'বন্ধন এক্সপ্রেস' এবং ঢাকা-কলকাতা রুটের 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' ট্রেনের উভয় প্রান্তে বহির্গমন ও কাস্টমস কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

ছিল তৎকালীন পূর্ব বাংলার সঙ্গে ভারতের রেল যোগোযোগ। ১৯৬৫ সালে ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ভারত-বাংলাদেশ রেল যোগোযোগের বিষয়টি সামনে আসে। দেশে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অনেক রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিচ্ছিন্ন রেল যোগাযোগ সচল করতে এবং দুই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি আনতে সরাসরি বাস চলাচল এবং আগে যেসব রুটে ট্রেন চলাচল ছিল তা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঢাকা-কলকাতা 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' চালু করার মাধ্যমে রেল যোগাযোগের শুভ সূচনা হয় কয়েক বছর আগে। এবার চালু হলো খুলনা-কলকাতা 'বন্ধন এক্সপ্রেস' ট্রেন। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সুষমা স্বরাজ, মমতা ব্যানার্জিসহ ভারতের জনগণকে বিজয়া ও দিওয়ালির শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। মৈত্রী এক্সপ্রেস ও বন্ধন এক্সপ্রেসের সাফল্য কামনা করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়, পর্যটন উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যর আরো উন্নতি হবে। দুই দেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে নরেন্দ্র মোদি বলেন, আজ আমাদের মৈত্রী-বন্ধন আরো দৃঢ় হলো। দুই দেশের কানেকটিভিটির ওপর জোর দিয়ে মোদি বলেন, কানেকটিভিটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষে মানুষে যোগোযোগ বৃদ্ধি। আর আজ আন্তর্জাতিক ম্যাসেঞ্জার টার্মিনালে কলকাতা–ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেসের মাধ্যমে যে পথচলা শুরু হলো, তাতে ভারত-কলকাতা-খুলনার যাত্রীদের অনেক সুবিধা হবে। এতে শুধু অভিবাসন ও শুল্কের সুবিধা হবে তা নয়, যাত্রার সময়ও ৩ ঘণ্টা বেঁচে যাবে। মোদি আরো বলেন, আমরা যখন কানেকটিভিটির কথা বলি, আমার ১৯৬৫ সালের আগের রেল যোগাযোগের কথা মনে পড়ে যায়। আমার খুব আনন্দ লাগছে যে, আমরা এই পথে এক পা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে যে ঐতিহাসিক যোগাযোগ আছে তা আরো মজবুত করতে আজ আমরা কয়েক পা এগোলাম। আমার বিশ্বাস, যেভাবে আমরা দুই দেশ নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক বাড়াবো এবং মানুষের মধ্যে আত্মীয়তা মজবুত করব ঠিক সেভাবেই উন্নতি ও অগ্রগতির নতুন আকাশ ছুঁতে সফলতা লাভ করব। এ কাজে সহযোগিতার জন্য শেখ হাসিনা ও মমতা ব্যানার্জিকেও ধন্যবাদ জানান মোদি। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, বন্ধন এক্সপ্রেসের মধ্য দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের সম্পর্কের বন্ধন আরো মজবুত হলো। এর মাধ্যমে দুই দেশের ঐক্য, সংস্কৃতি ও ভাষার সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে। এ সময় মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান। এ উপলক্ষে কলকাতার চিৎপুর আন্তর্জাতিক রেল টার্মিনালে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন জানায়, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চালু থাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস ও নতুন করে চালু হওয়া বন্ধন এক্সপ্রেস দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের প্রতীক। সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বন্ধন এক্সপ্রেস ১৬ নভেম্বর থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার খুলনা–কলকাতা চলাচল করবে।

খুলনা–কলকাতা সরাসরি রেল যোগাযোগ দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতকারী হাজার হাজার মানুষের যোগাযোগকে নিরাপদ ও সহজতর করবে। ৪ ঘণ্টায় যাওয়া যাবে এবং আসা যাবে। শুধু যাত্রী পরিবহণ নয়, ভবিষ্যতে পণ্য পরিবহণেও সরাসরি এই রেল যোগাযোগ বিরাট অবদান রাখবে –এই প্রত্যাশা দুই দেশের জনগণের।

লেখক : প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

জলবায়ু তহবিল ও প্যারিস জলবায়ু চুক্তি

নাজমা ইসলাম

জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রভাব মোকাবিলা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাবার অঙ্গীকার আজ বিশ্বব্যাপী সচেতন মহলের। দুই বছর আগে স্বাক্ষরিত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়ন ভালোভাবে এগোচ্ছে না। ১৯৫টি দেশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে চুক্তি অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে বছরে ১০ হাজার কোটি ডলার দেওয়ার কথা উন্নত দেশগুলোর। অথচ প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করে দাতারা জলবায়ু তহবিলে অর্থ দিতে গড়িমসি করছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কারণে দেশে দেশে জলবায়ুর যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তাতে সমগ্র পৃথিবী এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন স্পষ্ট করে তুলেছে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়ার বৈরী আচরণ অর্থাৎ গ্রিন হাউজ স্তরের ইফেক্ট, ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন স্তরের ঘনত্ব কমে যাওয়া, অতিমাত্রায় কার্বনযুক্ত গ্যাস নিঃসরণ, ভূমি ক্ষয় প্রভৃতি। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে।

বর্তমান বিশ্বে 'গ্রিন হাউজ ইফেক্ট' একটি আলোচিত বিষয়। 'ইফেক্ট' শব্দের অর্থ প্রতিক্রিয়া। এই পৃথিবীকে সবুজ রাখতে হলে বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হবে। না হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা কোথাও বেড়ে যাবে আবার কোথাও কমে যাবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানুষ ও প্রকৃতি।

বর্তমানে নানা কারণে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের মাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। মরু অঞ্চলের জমাটবাঁধা বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। সমুদ্রের লোনা পানিতে আবাদি জমি তলিয়ে যাচ্ছে। খরা, বন্যা, দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে গ্রিন হাউজ ইফেক্টের জন্য আমরা পৃথিবীর মানুষরাই দায়ী। গাড়ি, কলকারখানার ধোঁয়া ও জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলের যে ক্ষতি সাধিত হয় তা অপূরণীয়। গ্রিন হাউজ গ্যাসের মধ্যে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন নামে একটি গ্যাস আছে, যা ওজোন স্তরের জন্য ক্ষতিকর। ভূপৃষ্ঠের উপরে ২০-৩০ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে বায়ুর একটি স্তর। এর বৈজ্ঞানিক নাম স্ট্রাটো ফিয়ার। স্বাভাবিক অবস্থায় ওজোন স্তর ১৬ থেকে ৪৮ মিটার পুরো ওজোন কণা দিয়ে তৈরি।

ওজোন স্তরের কারণে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারে না। ওজোন স্তর ক্ষতিকর বেগুনি রশ্মিকে ছাঁকন বা ফিল্টারের মতো ছেঁকে দেয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের একটি ক্ষতিকর দিক হলো গ্লোবাল ওয়ার্মিং। ভূপৃষ্ঠে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকলে বায়ুমণ্ডল আগের তুলনায় অনেক বেশি সূর্যের আলো ধারণ করবে। ফলে ভূপৃষ্ঠ গরম হতে থাকবে। বিজ্ঞানীরা একেই 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' বলে অভিহিত করেন।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং -এর লক্ষণগুলো

১। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ গলতে থাকবে।

২। অনেক দেশের নিচু এলাকা এবং অনেক ছোটো ছোটো দ্বীপরাষ্ট্র চিরকালের জন্য সমুদ্রে হারিয়ে যাবে। মানুষ শরণার্থীর মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে।

৩। ঝড়, বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি ও খরার প্রকোপ বাড়বে।

৪। উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে রোগের প্রদুর্ভাব বাড়বে।

৫। জমির উর্বরতা হ্রাস ও ফসলহানি ঘটবে।

গত বছর ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলে

ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি

নদী ভাঙনের দৃশ্য

অবিশ্বাস ব্যক্ত করেন এবং তাঁর দেশকে প্যারিস চুক্তি থেকে বের করে নিয়ে আসার ঘোষণা দেন। আমেরিকা যদি সরে দাঁড়ায় তবে বিশ্বের জন্য কোনোভাবে তা আশাপ্রদ হবে না। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আমেরিকার এই মনোভাব প্রবল সমালোচনার মুখে আছে এবং ট্রাম্পও আছে দোটানায়।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে না দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় এবং সম্ভব হলে দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার প্রচেষ্টার কথা বলা হয়।

১৯৯২ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর একটি কাঠামোগত সমঝোতা (ইউএনএফসিসিসি) হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক কার্যক্রম চলছে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু তহবিলে অর্থ কোনো দান-খয়রাত নয়। শিল্পোন্নত দেশগুলো যুগ যুগ ধরে বেশি কার্বন পুড়িয়ে যে বায়ুদূষণ করছে এটা তারই ক্ষতিপূরণ, যাতে গবির দেশগুলো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে। উষ্ণায়ন ঠেকানো ধনী-গরিব দেশসহ পৃথিবীর প্রয়োজন। ধনী দেশগুলো এ বিষয়ে টালবাহানা করছে।

জলবায়ু ঝুঁকির শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০০৯ থেকে ২০১৭-এর আগস্ট পর্যন্ত জলবায়ু তহবিল থেকে মাত্র ২০ কোটি ডলার পেয়েছে বাংলাদেশ। অথচ জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী এ সময়ে বাংলাদেশের ১১ হাজার ৪৬৫ কোটি ডলার পাওয়ার কথা।

প্রতিশ্রুতি দিয়েও শিল্পোন্নত দেশগুলো অর্থ দিচ্ছে না উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। শিল্পোন্নত দেশগুলোকে চাপে রাখার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে জোট গড়ে তোলার কথা বলছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি শিল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বাড়ানো এবং দেনদরবারে যাওয়া।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো জলবায়ু তহবিলের অর্থে ভাগ বসাচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওভারসিস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (ওডিআই) এক গবেষণায় দেখিয়েছে, জলবায়ু খাতে গত এক দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে তার অর্ধেকই গেছে মাত্র ১০টি দেশে। অন্যদিকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো নামমাত্র বরাদ্দ পেয়েছে। তহবিল থেকে মরক্কো, মেক্সিকো ও ব্রাজিল ৫০ কোটি ডলার করে পেয়েছে, অথচ এই তিনটি দেশই বিশ্বের ১০ কার্বন নিঃসরণকারী দেশের মধ্যে রয়েছে।

ঋণ নয়, ক্ষতিপূরণ চায় উন্নয়নশীল দেশগুলো। বিদেশি সাহায্য পাওয়ার আগেই বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ২০০৯ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ)। বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু তহবিল গঠন করে প্রশংসিত হয়। এই তহবিলে ২০১৭ পর্যন্ত ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে যাবার প্রচেষ্টাকে রুখতে হবে এবং সম্মিলিতভাবেই এ ব্যাপারে দরিদ্র দেশগুলোকে জোটবদ্ধ হতে হবে। অন্যদিকে দরিদ্র দেশগুলোকেও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে হবে এবং হতে হবে কৌশলী। ঋণ নয়, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ধনী দেশগুলোকে।

লেখক : প্রাবন্ধিক

অশ্রুজল আর সৎমা

জিয়াউদ্দিন সাইমুম

অশ্রু বেদে ব্যবহৃত শব্দ। এটার মূলানুগ অর্থ 'যা ব্যাপ্ত করে'। অশ্রু শব্দটি ফারসিতে অশক্, আবেস্তায় asru, গ্রিকে oakru, জার্মানে zahre। মধ্যযুগের বাংলায় অশ্রুর প্রতিশব্দ হিসেবে 'অঝুর' ও 'অঝোর' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হতো। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর অভিধানে লিখেছেন, 'কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবির প্রিয় শব্দ অঝরু ও অঝোর। তাঁদের কাব্যে 'অঝরু ঝরায়ে আঁখি', 'অঝোর নয়' ইত্যাদি প্রয়োগ পাওয়া যায়।'

চৈতন্যচরিতামৃতে রয়েছে 'অঝোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন'। আর মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে রয়েছে 'সুরগণ সকলের অঝোর নয়'।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও অশ্রু অতি পরিচিত শব্দ (তব অঙ্গনে প্রতি ঘাসে ঘাসে অশ্রু আমার বল– সিকান্দার আবু জাফর; নিখিল ব্যথিত উন্মত লাগি এখনো তোমার অশ্রু ঝরে– ইসমাইল হোসেন শিরাজী; এই যে এক বিন্দু অশ্রুর খবর তা ঊষাবালা নিজেই জানে না; পাষাণ টুটিয়া গলিয়া পড়িবে অশ্রুর জাহ্নবী; আমার অশ্রু লাগিবে না সখি তার চেয়ে বেশি লোনা– কাজী নজরুল ইসলাম; অশ্রুর প্রথম পলাশটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেল; অঝরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়নে; কত কষ্টে করেছিনু অশ্রুবারি রোধ; পড়ুক দু' ফোঁটা অশ্রু জগতের পরে, যেন দুটি বাল্মিকীর শ্লোক– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

কালিদাস রায় অশ্রু অর্থে 'যমুনা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন (বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় গলিয়া যমুনা ঝরিয়া পড়ে, শচীনজননীর আঁধুয়া নয়নে সুরধুনী ধারা ঝরে)। আবার অশকবার মানে কান্নাসজল, অশ্রুসজল, কান্নাপেলব। ফারসিতে অশ্রু অর্থে 'আবগীনা' শব্দটিরও ব্যবহার রয়েছে। হিন্দিতে অশ্রুর সমতুল শব্দ 'আঁসূ'।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাংলা একাডেমির অভিধানেও বলা হয়েছে 'অশ্রুজল' শব্দটি অশুদ্ধ। দাবি করা হয় বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যে 'প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল' লিখেই বাংলা ভাষায় অতি বিতর্কিত শব্দটির জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শব্দটিকে গদ্য পদ্যে এমনভাবে ঠাঁই দিয়েছেন, অনেকে শব্দটার বিরোধিতা করার সাহস পাননি অথবা কবিগুরুর ভুল ধরাটা ঠিক মনে করেননি। পরে শরৎচন্দ্রও শব্দটিকে আপন করে নিয়েছেন (কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল– মেঘ ও রৌদ্র; অশ্রুজলের মালা পরাইয়া এই সঙ্গীহীন মানুষটিকে সেদিন বিদায় দিতে কেউ ছিল না– শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব)।

এখন অশ্রুজল বাংলা ভাষায় গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত শব্দ (গভীর ধেয়ানে বসিল বাবর শান্ত অচঞ্চল, প্রার্থনারত হাত দুটি তার নয়নে অশ্রুজল– জীবন বিনিময়, গোলাম মোস্তফা; দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ টপ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; দুটি ফোঁটা অশ্রুজলে মন্দির সোপান– সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত; দীপহীন ঘরে আধো নির্মীলিত সে দুটি আঁখির কোলে বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের মধুর মিনতি দোলে– প্রেমেন্দ্র মিত্র)।

মজার ব্যাপার হচ্ছে শব্দদ্বিত্বের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই জোরালো মত দিয়েছেন তাঁর *শব্দতত্ত্ব* ও *বাংলাভাষা পরিচয়* গ্রন্থ দুটিতে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এখন আর অশ্রুজলকে বাংলা ভাষা থেকে বিদায় করা যাবে না, এটা চলবেই। কারণ ওটাকে বাদ দিতে গেলে 'সচল', 'সঠিক', 'সকরুণ', 'সকাতর' শব্দগুলোকেও একই দোষে বাংলা ভাষা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। তারপরও অনেকে 'অশ্রুজল' শব্দটিকে অশুদ্ধ দাবি করেন। অশ্রু বলতে চোখের জল বোঝায়। যেমন করে 'বৃষ্টি' বলতে মেঘের পানি বোঝায়। তবে 'বৃষ্টির পানি'কে কেউ অশুদ্ধ বলেননি।

অশ্রুজলকে এভাবে ভাবলে সমস্যা থাকার কথা নয়। কারণ বাংলা ভাষায় শুধু অশ্রুজলই নয়, 'স্বেদবারি', 'অশ্রুবারি', 'আঁখিবারি' একই অপরাধ (?) করে বসে আছে। 'শিশিরসলিল'ও একই কাতারে পড়ে।

শব্দের গঠন সব সময় ব্যাকরণ অনুসরণ করে গঠিত হয় না। এ কারণে আর্যপ্রয়োগ, নিপাতনে সিদ্ধ ইত্যাদি টার্ম ব্যাকরণে চালু রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'অশ্রুজল' শব্দটি চালুর মাধ্যমে বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর উদ্ভাবনী মেধার পরিচয় রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অশ্রুজল শব্দটিকে অশুদ্ধ বলেননি, বলেছেন জোড়াশব্দ বা জোড়া মেলানো শব্দ। অন্যদিকে শব্দটিকে 'ভিন্ন প্রকৃতির জোড়াশব্দ' বলেছেন সুভাষ ভট্টাচার্য। আর চিন্তাহরণ চক্রবর্তী বলেছেন 'আতিশয্যবাচক স্বতন্ত্র শব্দ'।

তবে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য অনুসরণ করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী (অশ্রুজল সিঞ্চন করে আমি যে প্রেমের বল্লরী বাড়িয়ে তুলেছি, তারই করুণ করস্পর্শে পুষ্পে পুষ্পে মঞ্জুরিত হবে সে একদিন– শবনম), শঙ্খঘোষসহ অনেকেই 'অশ্রুজল' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

হরিচরণের অভিধানে 'অশ্রুবারি', 'অশ্রুসলিল' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অশ্রুজল শব্দটি সরাসরি ভুক্তিতে নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু অশ্রুজলই ব্যবহার করেননি, 'অশ্রুবারি' ও 'অশ্রুসলিল' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন (অশ্রুবারি মুছিল না; অশ্রুসলিল ধৌত হৃদয়ে থাক দিবসযামী)।

সুভাষ ভট্টাচার্য তাঁর প্রয়োগ অভিধানে লিখেছেন, 'সচল, সঠিক, সকাতর, সকরুণ প্রভৃতি শব্দকে যেমন ব্রাত্য বলে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না, অশ্রুজল সম্পর্কেও একই কথা।' আর সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম 'কত না অশ্রুজল'।

বিশেষণে সৎ মানে সত্তাযুক্ত, সত্য, শুভ, সাধু, বিদ্বান (এই সকল তীক্ষ্ণনাসিকা ক্ষুরোজ্জ্বল ক্ষুধারালো 'পেঁচালো' –বুদ্ধিগণ তিল হইতে তাল, সামান্য হইতে অসামান্য, সৎ হইতে অসৎ আবিষ্কার করিয়া সদনুষ্ঠানের প্রাণে বাঁকা কটাক্ষপাত করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল তাহার বুক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেন– বিজ্ঞতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে, যাহা থাকিবে, তাহাই সৎ; যাহা নাই বা থাকিবে না, তাহাই অসৎ– শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শুধু সৎ এবং উচ্চ দেখিয়া কাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়ো; এরূপ ধনসম্পত্তি লইয়া অরক্ষিতা অবস্থায় বেশি দিন থাকিয়ো না– কোরেল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; কোথায় সে যদুপতি, কোথা মথুরার গতি, অথ, চিন্তা করি ইতি কুরু মনস্থির মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ নহে সৎ, যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর– শ্রাবণের পত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

সংস্কৃত সপত্নী থেকেও বাংলায় সৎ শব্দটি এসেছে। এ সৎ অর্থ সতিন সম্পর্কিত (ঘরে সৎমা, তার কপালে দুর্ভোগের শেষ নেই; বলি তোর সৎমা আবাগী ভাত দিতে পারলে না যে এখানে এসেছিস হাঙ্গামা করতে?– মামলার ফল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, মধ্যযুগে 'সৎ মা'-কে লেখা হতো 'সাৎ মা'। যেমন বর পাইলা তুহ্মি সাৎ মা-এর পাস– শেখ ফয়জুল্লাহ।

মজার ব্যাপার হচ্ছে 'সৎ' অর্থ ভালো, সুতরাং 'সৎমা' অর্থ হওয়া উচিত 'ভালো যে মা'। কিন্তু সৎমা বলতে আমরা যা বুঝি, তাতে নিষ্ঠুরতা বোধহয় বেশিই থাকে। অথবা বলা যায়, সৎমায়ের নৃশংসতার কত করুণ কাহিনি অহরহ আমাদের শুনতে হয়, অনেককে দেখতে হয়, কাউকে কাউকে ভুগতেও হয়।

ভাষাবিদরা বলেন, সংস্কৃত সপত্নী থেকে 'সতিন' এবং সতিন থেকে 'সৎ' এসেছে। এ 'সৎ'-এর সঙ্গে 'মা' যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে সৎমা। মূলত সতীনের 'সৎ' থেকে 'সৎমা' শব্দের উৎপত্তি। তাই 'সৎমা' শব্দের 'সৎ' ভালো 'সৎ' নয়; সতিন সৎ।

পণ্ডিতের বাড়ি আসে নতুন বউ। অনেকে জানতে চাইতেন 'এ কোন ধরনের মা?' পণ্ডিত বলতেন 'সৎমা'। খুশি হতেন পণ্ডিতের নতুন বউ। এখনও এরূপ কথা দিয়ে-নিয়ে অনেকে নিজের 'নতুন বউ' ও 'সন্তানের সৎমা' ঘরে আনেন।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

নিবন্ধ

৩ নভেম্বর

অভিশপ্ত কালরাত

শাফিকুর রাহী

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে যে জঘন্য হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত করেছিল কতিপয় বিপথগামী সামরিক গুপ্তঘাতক তা বিশ্ব ইতিহাসে এক নজিরবিহীন কলঙ্কিত ও অভিশপ্ত অধ্যায়। বাংলা মায়ের শ্যামল-কোমল পবিত্র ভূমিকে বার বার রক্তাক্ত করেছে বিশ্বঘাতক ষড়যন্ত্রকারী স্বাধীনতার শত্রুরা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবার নির্মমভাবে হত্যা করা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। নরপশুদের সেই বীভৎস উন্মাদনায় নারী-শিশু কেউই রক্ষা পায়নি। তাদের এমন বর্বরোচিত আদিম লীলায় ধিক্কার জানিয়েছিল সভ্য মানবসমাজ, স্তম্ভিত হয়েছিল বিশ্ববিবেক।

যেহেতু ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বরের হত্যাযজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। অতএব ৩ নভেম্বরও জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা প্রযোজ্য বলে

মনে করি। ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ঘাতকরাই ২১ আগস্টের কুশিলব! একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পবিত্র ভূমিতে দেশ ধ্বংসের এমন দানবীয় অপকর্মে কারা নেকড়ের বেশে মেতে উঠেছিল? ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্জন সেলের ভেতর চার জাতীয় নেতা– বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ক্যাপটেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

যে চার জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছেন অথচ সে বীর সন্তানদের জীবন দিতে হয় দেশীয় আন্তর্জাতিক গুপ্তঘাতকদের ভয়ংকরী সন্ত্রাসের বীভৎস উল্লাসে। শোকাবহ জেল হত্যা দিবসে শুধু চার জাতীয় নেতাকে স্মরণ করলে চলবে না। সেই আদিম বর্বরতার ধারাবাহিক হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট। আজও তারা দেশে-বিদেশে তাদের মানবতাবিরোধী হিংস্র অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। যা সভ্য মানবসমাজ কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না।

৩ নভেম্বর, ১৫ আগস্ট আর ২১ আগস্ট– এ সবই একই চক্রান্তকারী, জঘন্য সন্ত্রাসী ও দেশদ্রোহী ঘাতকের ভয়ংকরী ষড়যন্ত্রের নষ্ট আস্ফালনেই সংগঠিত হয়েছিল। '৭৫-এর ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছিল এদেশের মাটি ও মানুষের গণদুশমনরা, অথচ আমরা কী দেখতে পেলাম- সেই খুনিদের পরবর্তীতে পুরস্কৃত করা হলো আর সমগ্র জাতি ভয়ংকর অন্ধকারে নিপতিত হলো।

সেই দেশদ্রোহী খুনিরা নানা ফন্দিফিকিরের ভেতর দিয়ে দেশটাকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার অপপ্রয়াসে মেতে ওঠে। বাংলার আকাশে-বাতাসে হারার রোদন ধ্বনিতে শোকে-ক্ষোভে স্তম্ভিত হলো সমগ্র বাংলাবাসী। কোথাও কোনো শুভ সংবাদ নেই। জেল-জুলুম, হত্যা, গুম-খুনের রামরাজত্ব কায়েম করেছিল সেই হারমাদ হায়েনারা।

৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবসে অঙ্গীকার হোক– আর যেন শ্যামলিমা বাংলা জননীর পবিত্র ভূমিকে রক্তাক্ত করার সাহস না পায় কোনো নরঘাতক হিংস্র পশুর দল। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মাধ্যমে দেশ কিছুটা কলঙ্কমুক্ত ও অভিশাপমুক্ত হয়েছে।

পঁচাত্তরের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতের সেই আদিম বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে সমগ্র বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়েছিল। সভ্য দুনিয়াতে এমন জঘন্য হত্যাকাণ্ড কোথাও এর আগে কখনো ঘটেনি। ওইসব বিশ্বাসঘাতকদের যারা লালনপালন করেছে তাদেরও বিচারের আওতায় আনতে হবে এবং এদেরও সর্বোচ্চ সাজা কার্যকর করতে হবে। এরা আজও দেশ-বিদেশে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার অব্যাহত রেখেছে।

সর্বস্তরের মেহনতি মানুষের মলিন মুখে হাসি ফোটাতে হবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের অভাব দূরীকরণের মাধ্যমে। বর্তমান সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সেদিকে দৃঢ়তার সাথে ক্রমাগত ধাবিত হচ্ছেন এবং তিনি সর্বকর্মে সফলতাও অর্জন করছেন। মানুষের হারানো গৌরব ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী বহু প্রশংসা কুড়িয়েছেন নানামুখী গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার স্বপ্ন সফল হলেই তাঁদের বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে।

আজ হোক, কাল হোক বাঙালি জাতি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবে একদিন ইনশাল্লাহ। চার জাতীয় নেতার অপরিসীম আত্মত্যাগের অমরগাথায় বিকশিত হবে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা। জাতি কোনোদিন তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারবে না, তাঁদের অমর কীর্তিগাথা আলোকিত আগামীর স্বপ্নে এগিয়ে যাবে বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্পে।

আজ পরিকল্পিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠছে আমাদের দেশে। আর সে কারণেই রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় দূর হবে সবক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধুর মহান আদর্শ আর চার জাতীয় শহিদ নেতার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের গৌরবোজ্জ্বল আলোকিত অধ্যায়ের ভেতর দিয়ে শুভ পথচলায় চিরকাল উদ্দীপনা ও প্রেরণা জোগাবে।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

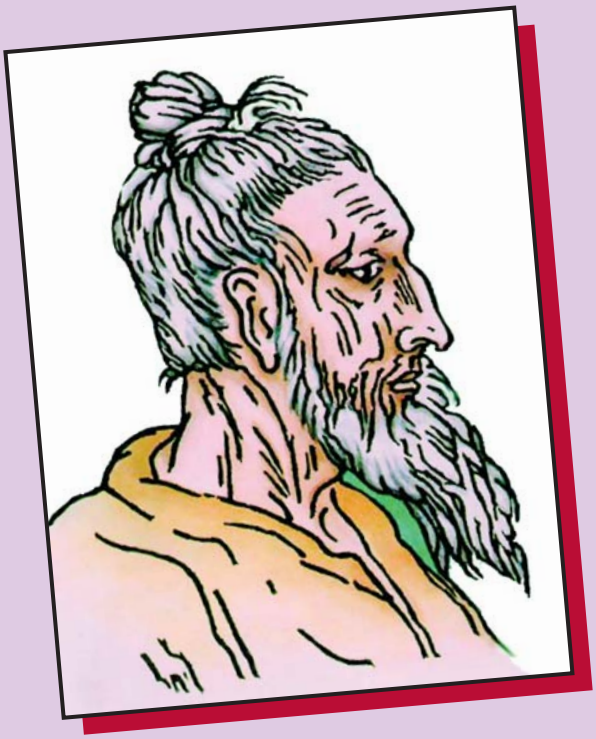

লালনের দেশে ঠাকুরের ঘরে

হুমায়ূন মুজিব

শরতের এক সন্ধ্যায় আমি ও আমার বন্ধু গোলাম রায়হান লিটিল লালনের আখড়া থেকে বের হয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম কালী নদীর ধারে। এই সেই কালী নদী– যার সাথে লালনের জীবনেতিহাস জড়িত। এই নদী দিয়েই বসন্ত আক্রান্ত লালন একদা কলাগাছের ভেলায় ভেসে এসেছিলেন মুমূর্ষাবস্থায়। এই কালী নদীর তীরে জলের কলস কাঁখে করে এসেছিলেন মহীয়সী নারী মতিজান ফকিরানী। গৃহস্থালির জল তুলতে এসে পেয়েছিলেন কলার ভেলায় ভাসমান মৃতপ্রায় লালনকে। মমতাময়ী মতিজান লালনকে পরম মমতায় তুলে নিলেন। নিয়ে গেলেন নিজ বাড়িতে। তাকে মাতৃস্নেহ দিয়ে সেবাশুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলে লালনপালন করলেন। ভিন গাঁ থেকে অদৃষ্টের লেখায় ভেসে এসে কালী নদীর এই পাড়েই পরবর্তীতে সৃষ্টি হলো লালন জীবনের বিস্ময়কর গাথা উপাখ্যান। নদীর পাড়ে বসে সেসব কথাই কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল। ভাবলাম, প্রায় আড়াইশত বছর পূর্বে যখন প্রবহমান নদীর স্রোতে লালন ভেসে এসেছিলেন তখন এই নদী কেমন ছিল ? সে তখন কতটা প্রশস্ততা নিয়ে প্রবাহিত হতো ? কতটা খরস্রোতা ছিল সে? এই নদী যদি আজ অবরুদ্ধ না হতো তবে তার রূপ এখন কেমন হতো ? এসব ভাবছি আর কালীর অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো জল দেখছি। এর পাড়ে এখন লালন মেলা হয়। এই মাঠে তখন তিল ধরনের ঠাঁই থাকে না মানুষের ভীড়ে। আমরা এদিকওদিক ঘুরতে ঘুরতে এসে মাঠে প্রবেশদ্বারের কাছে বসে চা খেলাম। তারপর খুঁজতে বের হলাম আর এক বন্ধুকে। সে লালন দর্শনে প্রভাবিত হয়ে ঢাকা ছেড়ে এখানে এসে কোথায় যেন আবাস গেড়েছে। বেশ ক'বছর ধরে সে ছেউড়িয়াতে আছে। কয়েক জনকে জিজ্ঞেস করলে দু'একজন তাকে কিঞ্চিৎ চিনতে পারল। কিন্তু সঠিক ঠিকানা কেউ বলতে পারল না। দু'একজন অঙ্গুলি নির্দেশ করে অনির্দিষ্ট কোনো গলিপথের কথা বলল যে, সে ব্যক্তি এ গলির কোথাও কোনো বাড়িতে থাকতে পারে। কবি লিটিল আর আমি দু'একটা অন্ধকার গলির বেশ কিছুদূর অগ্রসর হলাম তার খোঁজে। তার ফোন নম্বর থাকলেও তাকে আচানক চমকে দেওয়ার অভিপ্রায়ে ফোন দিলাম না। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পর আমরা ব্যর্থ হলাম। বাধ্য হয়ে তখন তাকে ফোন করলাম। সে ফোন ধরল এবং কথা বলল। কিন্তু অজ্ঞাত কোনো কারণে সে তার ঠিকানা বলতে রাজি হলো না। বলল, পরের দিন সে নিজে এসে দেখা করবে। যা হোক, আমরা সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে রেললাইনের দিকে এলাম। রেললাইন ধরে চলে এলাম ইনসান ভাইয়ের বাসায়। ইনসান ভাই তখনো ফেরেনি। তার আরো কিছু লোকজন আছে। তাদের সাথে সময় কাটিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরল। আমরা তিনজন রাতের খাবার খাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলাম। হোটেলে যাওয়ার পথে পড়ে 'টেগোর লজ'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জমিদারির কাজ বা অন্য কোনো কারণে কুষ্টিয়া শহরে আসতেন তখন এই বাড়িতে থাকতেন। 'টেগোর লজ' নিজে কৌতূহল দেখানোয় ইনসান ভাই বলল, চলেন ভিতরে ঢুকে ঘুরে দেখে আসি। তার কথায় ভিতরে ঢুকলাম। সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এটা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এখানকার কেয়ারটেকার ও অন্যান্য লোকজন ইনসান ভাইয়ের পরিচিত। সেই সুবাদে সহজে ঘুরে দেখার সুযোগ পেলাম। নিচে বসার ঘর। দোতলায় আছে অসংখ্য ফটোগ্রাফ। একনজর ঘুরে দেখলাম। এত অল্প সময়ে রবীন্দ্রনাথের এইসব ছবি দেখা সম্ভব নয়। বিশেষত তাঁর এসব ছবি যখন তাঁর জীবনের কথা বলে, সময়ের চিত্র তুলে ধরে। পেছনের বারান্দায় গিয়ে দেখলাম বিল্ডিংয়ের পেছনে বিশাল মঞ্চ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলে এখানে নাটক ও নাচ-গানের আয়োজন করা হতো। মঞ্চের পাশে দু'দিকে দর্শক গ্যালারি রয়েছে। জলসা উপভোগ করার চমৎকার ব্যবস্থা। এইসব মঞ্চ ও গ্যালারি দেখে কল্পনা চলে গেল শতবর্ষ পূর্বের রবীন্দ্র সময়ে যখন বিধাতার পক্ষ থেকে বাঙালির জন্য এক পরম উপহার শ্রী রবীন্দ্রনাথ নামে এখানে বিচরণ করতেন কখনো-সখনো। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে অদেখা সেই সময়ের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু সময় বড়ো নিষ্ঠুর। আর একটু পর গেলে হোটেলে খাবার পাব না। আমরা নিচে নেমে 'টেগোর লজ' দেখার সুযোগ দেওয়ার জন্য কেয়ারটেকারকে ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে এলাম। বের হয়েও 'টেগোর লজ'-এর দেয়াল গাত্রে ঠাকুরের কিছু বাণী পড়লাম। তার একটা এখনো মনকে নাড়া দেয় 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় / অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় / লোভিব মুক্তির স্বাদ / কী গভীর বাস্তব অনুভূতির দর্শনের গীতল শৈল্পিক প্রকাশ। এ জন্যই তিনি আমাদের লোক'। তিনি রবীন্দ্রনাথ। এসব ভাবতে ভাবতে হোটেলে গেলাম। ঘরোয়া ধরনের সাধারণ হোটেল। চাকচিক্য নেই। কিন্তু খেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায়। খাওয়া শেষ করে হাঁটতে হাঁটতে, গল্প করতে করতে মোটামুটি রাতের নিভৃত শহরের রূপ দেখতে দেখতে আমরা বাসায় ফিরলাম। সংসারহীন ইনসান

ভাইয়ের বাসা। আমিও তথৈবচ। মনে হলো, 'ঘর করলাম না আমি সংসার করলাম না / আউল বাউল ফকির সেজে ভেক নিলাম না'। কথাবার্তায় লিটিল বলল, সে এ জীবন এক সময় যাপন করেছে। কাজেই তার অসুবিধা হবে না। ইনসান ভাই পাশের খালি রুমে একটা পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। আর আমরা তার এলোমেলো একমাত্র বিছানা দখল করে যথাসাধ্য ঝেড়েটেড়ে শুয়ে পড়লাম। জার্নি আর ঘোরাঘুরি করার কারণে শরীর ক্লান্ত ছিল। ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না।

সকালে উঠলাম। আজকের উদ্দেশ্য শিলাইদহে যাওয়া। গোসল সেরে তিনজন রওয়ানা দিলাম। কুষ্টিয়া শহর থেকে একটা বড়ো রাস্তা চলে গেছে গড়াই নদীর পাড়ে। আমরা রিকশায় করে বড়ো রাস্তার কাছে গেলাম। কিন্তু এখান থেকে গড়াই অনেক পথ। রিকশা অত দূর যাবে না। বাসেও খুব ভীড়। অগত্যা একটা ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে চড়ে বসলাম। রাস্তার দু'পাশে সুন্দর প্রকৃতি। এক পাশে কিছুদূর পর্যন্ত কালী নদীর একটা অংশ প্রবাহিত। খোলা ভ্যানে এসব দেখতে দেখতে গড়াইয়ের তীরে পৌঁছুলাম। সেখান থেকে একটা বাসে চড়ে কিছুদূর গেলাম। তারপর আবার একটা ভ্যান ঠিক করে নিলাম। একটা কিশোর ছেলে ভ্যানের চালক। কথাবার্তায় বেশ পাকা। নিভৃত গ্রামের মধ্য দিয়ে চলে গেছে রাস্তা শিলাইদহের দিকে। এখানে শুধু একটি পাকা রাস্তা আছে যাতায়াতের জন্য। আর সবই একেবারেই গ্রাম। কাঁচা বাড়িঘর। ডোবানালা, ফসলের ক্ষেত। মনে মনে ভাবি, এক-দেড় শত বছর পূর্বে এসব অঞ্চল তাহলে কেমন ছিল। এইসব এলাকার জমিদারি ছিল কলকাতার ঠাকুর পরিবারের। সেই জমিদারি দেখাশোনা করতে আসতেন রবীন্দ্রনাথ। পদ্মায় বোটে ঘুরে ঘুরে তিনি অত্র অঞ্চল দেখতেন, বুঝতেন। যেতে যেতে দেখলাম পথের পাশে একটা তাঁতঘর। সেখানে নামলাম। বাঁশ-কাঠের বেড়া দেওয়া একটা ঘরে হাতে টানা তাঁতের মাকু চলছে ঘট ঘট শব্দে। এই যান্ত্রিক ও প্রযুক্তির যুগে তাদের আজও হাতে চালানো তাঁতে কাপড় বুনে টিকে থাকতে হচ্ছে কষ্টেসৃষ্টে। সেখান থেকে বের হয়ে আবার ভ্যানে চড়লাম। আমরা ভ্যানে চড়ে একেবারে রাস্তা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেই পদ্মার পাড়ে চলে গেলাম। পদ্মার বুকে এখন জলে পরিপূর্ণ। সে এখন অনেক প্রশস্ত। ওপারে পাবনা। ওপার থেকে নৌকায় করে কাঁচামালের ব্যবসায়ীরা তরকারি নিয়ে আসছে এপারে বিক্রি করতে।

এই সেই পদ্মা। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। ভারতের মধ্যে এর নাম গঙ্গা। বাংলাদেশের মধ্যে ঢোকার পর 'পদ্মা' নাম ধারণ করেছে। যুগ যুগ ধরে এই পদ্মার তীরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য জনপদ। আর কতশত বছরের বিচিত্র ইতিহাস-স্মৃতি-কাহিনি গাথা ধারণ করে আজও প্রবহমান এই নদী। প্রমত্তা পদ্মাকে নিয়ে কত গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচিত হয়েছে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে– 'পদ্মার ঢেউরে / মোর শূন্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যারে/ পদ্মার ঢেউরে। পদ্মার ইলিশ বলতে গেলে পৃথিবী বিখ্যাত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' আর এক কালোত্তীর্ণ উপাখ্যান। কিন্তু পদ্মার সেই অতীত গৌরব এখন অনেকটাই ম্রিয়মান। এর কোথাও কোথাও বিশালায়তনের চর পড়ে ক্রমে লোকালয়ের সৃষ্টি হয়েছে। তার গভীরতাও আর আগের মতো নেই। মাছের দেখাও আর আগের মতো মেলে না পদ্মায়। নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে তার পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে যেন খানিকটা মাতৃস্নেহ গায়ে মেখে নিয়ে চলে এলাম শিলাইদহে।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি। জমিদার রবীন্দ্রনাথ এখানে বসে তাঁর এই এলাকার জমিদারি পরিচালনা করতেন। এখানে বসেই বাংলা সাহিত্যের অনেক অক্ষয় কীর্তি সৃষ্টি হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। এমনকি নোবেল জয়ী কাব্যগ্রন্থ *গীতাঞ্জলির* অনেক কবিতা এই কুঠিবাড়িতে বসেই লেখা। শুধু তাই নয় *গীতাঞ্জলির* ইংরেজি অনুবাদ কবিগুরু করেছিলেন শিলাইদহে বসে তাঁর স্নেহধন্য ভ্রাতৃষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর অনুরোধে। বাংলা সাহিত্যের আলোচনা উঠলে শিলাইদহের উল্লেখ তাই অবধারিত।

আমরা টিকিট করে কুঠিবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম। মূল ভবনটি তিন তলা। সেই সময়ের তৈরি। ছোটো ছোটো কুঠুরি। সাদামাটা আকৃতির ও নকশার মধ্যেও এক ধরনের অভিজাত নান্দনিকতা ফুটে ওঠে। জানিনা ঠাকুরের প্রতি আলাদা রকম দুর্বলতা থাকার কারণে এমনটি মনে হয় কি-না। দেয়ালে দেয়ালে অসংখ্য ছবি। রবীন্দ্রনাথের শিশু বয়স থেকে তাঁর অশীতিপর বার্ধক্য পর্যন্ত বিচিত্র প্রেক্ষাপটের ছবি তাঁর বাঙময় জীবনকেই যেন তিল তিল করে তুলে ধরে। ছবিগুলো দেখে আপ্লুত হলাম, কল্পলোকে আবাহন করলাম আর কখন হারিয়ে গেলাম উদাসী ভাবনায়। মনে হলো, 'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে। মুকুল গুলি ঝরে'। তিন তলায় দেখলাম কবির স্পিড বোট, যাতে করে তিনি বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। আরো কিছু ব্যবহার্য জিনিসপত্র। সবকিছুই যেন কল্পলোকের সেইসব গল্পগাথার দিনে নিয়ে যায়। এক সময় দূর অতীতের সেই অনুরণন চেতনায় ধারণ করে বেরিয়ে এলাম কুঠিবাড়ির মূল ভবন ছেড়ে। তখন কানে ভেসে আসছে রবীন্দ্র সংগীতের খুব পরিচিত গান– 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ / আমার মন ভুলায় রে'। কুঠিবাড়ির মূল ভবনের বাইরে বিভিন্ন পয়েন্টে লম্বা পোস্টের সাথে সাউন্ড বক্স লাগানো রয়েছে। তার মাধ্যমে কোমল হৃদয়স্পর্শী সুললিত রবীন্দ্র সংগীতের সুর আমোদিত করে দর্শনার্থীদের। আমরা হাঁটতে হাঁটতে গেলাম দীঘির ঘাটে। দেখলাম তিন-চারজন তরুণ সেখানে ঘাটের একপাশে পাটি বিছিয়ে হারমোনিয়াম ও তবলা বাজিয়ে রবীন্দ্র সংগীত গাইছে। ওরা কেউ এলে গান করে। বড়ো মিষ্টি গলা তরুণ ছেলেটির। বেশভূষায় দরিদ্র মনে হলো। আশা, যদি গান শুনে কেউ কিছু টাকা দেয়। ঘাটের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বজরা দেখতে গেলাম। সম্ভবত আসল নয় এটা। দর্শনার্থীদের জন্য আসল বজরার আকৃতিতে ডামি তৈরি করে রাখা হয়েছে। আর চারদিকে বিচিত্র রকমের বৃক্ষরাজি। সবকিছুর সাথে পরিচয় নেই। ইনসান ভাই আবার চন্দন গাছের পাগল। সে খুঁজতে খুঁজতে দু'একটা পেয়েও গেল। এবার সেই চন্দন গাছের নিচে চন্দনের বিচি এবং চারা খুঁজতে লাগল। যদিও পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। এরপর আমরা কুঠিবাড়ির পেছন দিক দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম। একটা বুড়ো বটের নিচে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। বেশ নয়নাভিরাম করে গাছগাছালি লাগানো এবং সজ্জিত করা হয়েছে রবীন্দ্র কুঠিবাড়িটিকে। পেছনে রাস্তা দিয়ে ঘুরে সামনের রাস্তায় যেতে আবার আরেকটা সাউন্ড বক্স। শুনলাম মিষ্টি গলায় গাইছে কোনো নারী কণ্ঠ, 'তুমি কোন কাননের ফুল/ কোন গগনের তারা'। মনে মনে বলি, কোন কাননের ফুল আবার আমরা সবাই রবীন্দ্র কাননের ফুল। সুরেলা সেই কণ্ঠ শুনতে শুনতে আমরা গেটের দিকে পা বাড়ালাম। আমাদেরকে ফিরতে হবে। সামনের দিকে এগোতে গিয়েও ক'বার ফিরে তাকালাম। বাংলার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম সেরা সময় কাটানো স্থান এই কুঠিবাড়ি যা আমরা এখন পেছনে ফেলে অথচ চেতনায় ধারণ করে ফিরে যাচ্ছি।

লেখক : সাংবাদিক, এশিয়া বার্তা

সোনার লখিন্দর

ফজলে আহমেদ

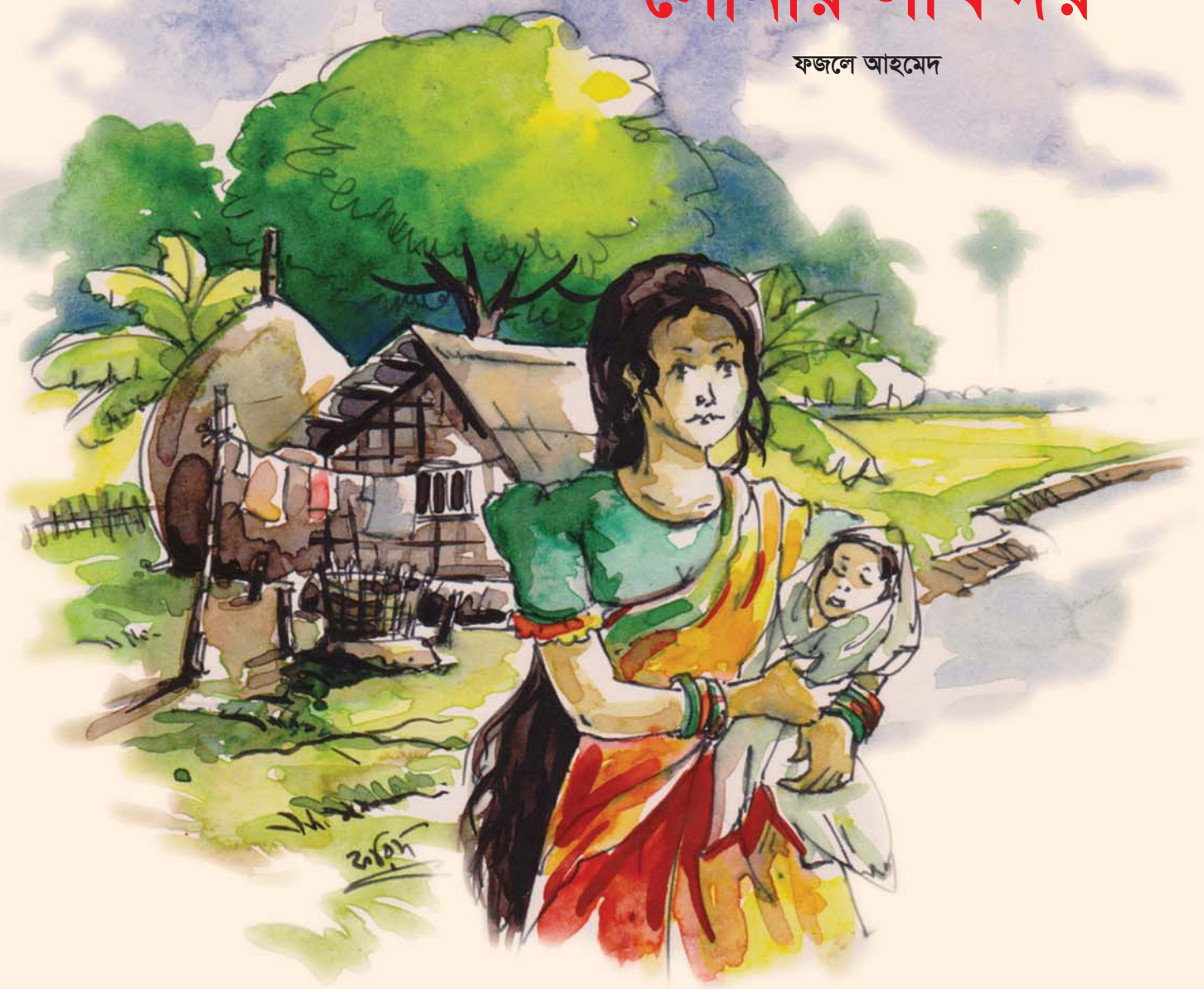

একজন পথহারা পথিক যখন পথ খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার নিজের ওপরই মহাবিরক্তি ধরে যায়। যারা আলোর সন্ধান পেতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে যায় অথচ আলোর সন্ধান লাভ করতে পারে না, তারা ব্যর্থ হয়ে নিজেকে দুর্ভাগা বলে মনে করে। বাহারের জীবনে ঠিক তেমনটিই ঘটেছে। কারণ তার শিক্ষার দৌড় একেবারেই কম, যা দিয়ে চাকরির চেষ্টা করারও কোনো সুযোগ নেই। তারপরেও চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে কিন্তু কারো জীবনই থেমে থাকেনি। তারটাও না। অন্যদিকে প্রেমিকা সুপ্তির বাড়াবাড়ি চরম পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। তার কথা একেবারেই স্পষ্ট– হয় বিয়ের ব্যবস্থা কর, নইলে সাফ জানিয়ে দাও। আমি বাবা-মার কথায় রাজি হয়ে যাই। আমি এইভাবে শূন্যে ঝুলে থাকতে পারব না। বেকার জীবনের যন্ত্রণা সইতে সইতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বাহার। তারপরে সুপ্তির চাপ, একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তবে এইটুকুই সান্ত্বনা ও ভরসা যে, আল্লাহ তায়ালা রিজিক নির্ধারণ করেই মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান। তবে বাহারের শেষ ভরসা এইটুকু যে, তাদের যে ধানের জমি আছে, সেখান থেকে যে পরিমাণ ফসল আসবে, তা দিয়ে সারাবছর চারটে ভাত খেয়ে যেতে পারবে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করে একটি নির্দিষ্ট দিনে সুপ্তিকে বউ করে ঘরে তোলে। বাহারের একটা ধারণা ও বিশ্বাস ছিল, প্রেমের কঠিন যন্ত্রণার চেয়ে বউয়ের যন্ত্রণার পরিমাণ অনেক কম হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। কারণ প্রেমের সময়টাতে একজনের কাছে অন্যজন একেবারেই নিখুঁত থাকে। কিন্তু বিয়ের পর দুজনের একজনও নিখুঁত থাকে না। কেবলই খুঁত বেরিয়ে পড়ে। সুপ্তি মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলে থাকে, তুমি

তো বিয়ের আগে এমনটি ছিলে না। কয়েক মাসের মধ্যেই এত পরিবর্তন, যা ভাবতে গেলে আমি অবাক হয়ে যাই। তোমার মনে কি এটাই ছিল? বাহারের উলটো কথা, সুপ্তি তুমি না বলেছিলে প্রয়োজনে আমরা দু জন গাছতলায় বসবাস করব।

একজনের অন্যজনের উপর আস্থা, বিশ্বাস ক্রমেই কমে যেতে থাকে এবং অবিশ্বাসের পাল্লাটা ভারী হতে থাকে। আসলে এসবের মূলে হলো অর্থ। সংসার জীবনে অর্থের কোনো বিকল্প নেই। আর অভাব-অনটনের সংসারে সুখ-শান্তির অস্তিত্বটুকুর খোঁজ পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

সময় ও নদীর স্রোত কখনো বসে থাকে না। তেমনই বসে থাকে না কারো জীবনের রঙিন দিন, এমনকি কষ্টের দিনও। দেখতে দেখতে তাদের সংসারে একটি মেয়ে চলে আসে। মেয়ের আলোতে সংসার আলোকিত হলেও অর্থের অভাবটা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। মেয়ের পেছনে একটা খরচ হচ্ছে। যত দিন যাবে খরচের পরিমাণটা বেড়ে যেতে থাকবে। বর্তমানে পড়াশোনার পেছনে প্রচুর টাকা ঢালতে হয়। রেজাল্ট আসে টাকা খরচের মাধ্যমে। ব্যাপারটা দু জনকে ভাবিয়ে তোলে। ভেতরে ভেতরে একটা তাগিদ অনুভব করতে থাকে। এমনকি দেখতে দেখতে মেয়েটিও বড়ো হয়ে যাবে।

একদিন সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে বিমানে ওঠে বাহার। ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে। ভালো একটা কোম্পানিতেও চাকরি হয়ে যায় তার। যা তার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। এদিকে সেজুতিকে ভালো একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে বাসায় টিউটর রেখে দেয়। সেজুতির রেজাল্ট ভালো করার জন্য যা করার দরকার তাই করে যাচ্ছে ওরা।

কোনো কোনো মানুষের জীবনে উন্নতির সুযোগ আসে। এই সুযোগটা কেউ কাজে লাগাতে পারে, কেউ পারে না। বাহার পুরোপুরি কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। ফলে সংসারের খরচ চালিয়ে বাড়তি টাকার পরিমাণটা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। আর ওই টাকা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। নজর দেয় জমি কেনার দিকে।

গয়েশপুর বাজারের ঠিক মাঝখানে, রেল লাইনের পূর্ব দিকে এককাঠা জমি কিনে ফেলে। এখানে যে-কোনো সময় ঘর বা বিল্ডিং করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালু করা যাবে।

ব্যবসায় সাফল্যের জন্য যে স্থানগুলো খুব বেশি উপযোগী এই স্থানটা তার অন্যতম। তাই সাফল্যের এক ধাপ সে এগিয়ে আছে। তা সে উপলব্ধি করতে পারে। তাই চাকরিতে সে খুব বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে এবং বাড়তি উপার্জনের জন্যে ওভারটাইম করতে ছাড়ে না। তাতে যত হাড়ভাঙা খাটুনি হোক না কেন।

বাহার তৃতীয়বার দেশে এলে গয়েশপুরের এই কেনা জায়গাটুকুর মাঝে হয় কয়েকটা দোকান, নইলে একটা বাসা করতে সুপ্তি প্রচণ্ডভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। প্রথমে বাহার রাজি হলেও কিছুদিন পর তার মত পালটিয়ে ফেলে। সে আরো বড়ো স্বপ্ন দেখতে থাকে এবং মনে মনে স্থির করে, এবার আর চাকরি নয়, সরাসরি ব্যবসায় নামবে। তাও এদেশে নয়। সৌদি আরবে। কারণ সেখানে ব্যবসাটা খুবই লাভজনক এবং সঠিকভাবে ব্যবসা করার অনেক সুযোগ আছে। বাংলাদেশের মতো প্রতারকের খপ্পড়ে পড়ার কোনো সুযোগ নেই। যে দেশে আইন আছে, আর সে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক ফোটা ছাড় নেই, সে দেশে ব্যবসা করাটা খুবই নিরাপদ।

সুপ্তি যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বাহারকে অবিরাম চাপ দিচ্ছিল, তা একেবারেই ভাটা পড়ে যায় অল্প সময়ে অধিক টাকা উপার্জনের মনোবৃত্তির কাছে। বাহারের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ– এতটা বছর যখন ধৈর্য ধরেছি, দু-একটা বছর তেমন কী আর। তাছাড়া টাকা যাকে একবার ধরা দেয় তাকে আর সহজে ছাড়ে না। সুতরাং আমাদেরকেও ছাড়বে না। বাকিটা আল্লাহর হাতে। এদিকে তাদের সংসারে দুটো মেয়ের পর সুপ্তি সাফ জানিয়ে দেয়, আমরা ওই দুজনকে নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই। এ নিয়ে নতুন করে ভাবনার কোনো দরকার নেই।

এই প্রস্তাবটা বাহার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। অধিকার নয়, রীতিমতো আবদার জানিয়ে বলল, সুপ্তি, আমার এই অদম্য ইচ্ছেটাকে অনেক চেষ্টা করেও নিবৃত করতে পারিনি।

– ওসব তোমার একেবারেই পাগলামি।

– পাগলামি নয়, সত্যি বলছি। ছেলে হোক, মেয়ে হোক আরেকটা সন্তান আমি চাই। যদি মেয়ে হয়, তাহলে তো তোমার মন অনেক খারাপ হয়ে যাবে।

– তুমি দেখে নিও, একটুও খারাপ হবে না। বরং অনেক খুশি থাকব।

সুপ্তি আর না করতে পারেনি। বাহারও সুপ্তিকে অপরাগতার সুযোগটুকুও দেয়নি। কারণ ভালোবাসার দাবি অনেক বড়ো। যা উপেক্ষা করা যায় না।

এবার চাকরি নয়, ব্যবসায় নামব– এই মনোবৃত্তি নিয়েই সৌদি পাড়ি জমায় বাহার। কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যবসাটা জমিয়ে তুলতে থাকে। আস্তে আস্তে ব্যবসাটা প্রসার লাভ করতে থাকে। যে স্বপ্ন নিয়ে এবার এসেছিল, তা পরিপূর্ণভাবে সফল হতে যাচ্ছে।

পৃথিবীতে সুপ্তির তৃতীয় সন্তান আসবে। তাই তাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। এই সন্তানও মেয়ে হলো। সুপ্তির ধারণা ছিল খবরটা শুনে বাহারের মনটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু ঘটল তার উলটো। বাহার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি মন খারাপ কর না। এখানে মানুষের কোনো হাত নেই। আল্লাহ যা দিয়েছে তাতেই আমি খুশি। তুমিও খুশি থেক। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর– মেয়ে তিনটিকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

বাহার সকালে কাজে যাবে। গোসল করে, নাস্তা খেয়ে কাপড়-চোপড় পরতে থাকে। শার্ট-প্যান্ট পরা শেষ হলে বা পায়ে মোজা পরা শেষ করে ডান পায়ে পরার জন্য মোজাটা হাতে নেয়। অমনি ধপাস করে মেঝেতে পড়ে যায়। খানিকটা সময় ছটফট, তারপর কালঘুমে ঢলে পড়ে।

সুপ্তি এখন হাসপাতালের বেডে। তার চারদিকে অবস্থান করছে সেজুতি, সোহাগী, তার মা, শ্বাশুড়ি ও অসংখ্য আত্মীয়স্বজন। বাহারের মৃত্যুর সংবাদটা অবশ্যই তাকে জানাতে হবে। শ্বাশুড়ি ডিটেলস বলল।

সুপ্তি শোনার পর মুখ দিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনি। চোখ থেকে এক ফোটা পানি পড়েনি। কোনো রকম নড়াচড়া করেনি। বসে আছে।

সুপ্তির মা ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরে মেয়ে দুটোকে কাছে ডেকে আনে ও সদ্য আগত মেয়েটাকে তার কোলে তুলে দেয়। সুপ্তি তখন পৃথিবীর সমস্ত নিরবতা ভেঙে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে এবং নিরুত্তাপ গলায় বলে, আমি শুধু তোমাদের জন্য বেঁচে থাকব।

না তোমাকে না কবিতাকে

নাসির আহমেদ

তুমি আমার হারিয়ে যাওয়া একটি প্রিয় পঙ্‌ক্তির উপমা, হঠাৎ স্নায়ুতে
এসে হাজার হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের এক সেকেন্ড শক রেখে
চলে যাওয়া সেই দুর্লভ পঙ্‌ক্তি- যার তুলনা কোথাও নেই পৃথিবীর
যার চিত্রকল্প অর্থব্যঞ্জনা প্রকাশের মতো ভাষাও অনায়ত্ত আমার।

পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষটির মতো অবর্ণনীয় নিঃস্বতায়
আমার স্নায়ু খুঁজে ফিরছে শেষ রাতের স্বপ্নে এসে হঠাৎ
হারিয়ে যাওয়া সেই মোহন পঙ্‌ক্তিটি, যা আমার হলে
একজন কালোত্তীর্ণ কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারতাম আমিও।

পৃথিবীর কোনো শিল্পের সঙ্গে তোমার তুলনা করি না। তাতে
সত্যিই অপমান হয় তোমার অনির্বচনীয় ঐশ্বর্যের। আমি
এক গভীর ধ্যানের মধ্যে তোমাকে খুঁজছি অহর্নিশ, দিবসে,
রাত্রে, ঘুমে-জাগরণে। অজস্র শব্দ ও বাক্যে মিলছ না তুমি।

যদি পৃথিবীর কোনো নারী জানত রহস্যময়ী রাত্রির মতো
এক আশ্চর্য অন্ধকারের জন্য, প্লাবিত অথই জ্যোৎস্নার
জন্য একজন কবির জীবন কী রকম দুস্থ আর নিঃস্ব হয়ে
আছে, তাহলে নিশ্চিত জানি হারানো পঙ্‌ক্তি ফিরে আসতই।

নির্বাসিত জোছনা

অর্ণব আশিক

চাঁদ দেখা হয়ে গেলে
সব প্রেমিক-প্রেমিকা
ফিরে যায় ঘরে
অনন্ত অন্ধকার পরে থাকে
দুজনের হৃদয়ের কোণে।

রাত গভীর হয়
বেদনার ধুলো পড়ে
দুজনার হৃদয়ের শার্শিতে।
ডাক দেয় প্রকৃতি ও আদিম স্বভাব
সেই পথ বড়ো চেনা
বড়ো অচেনা এই কড়া নাড়া
ভেতরে ভেতরে প্রাপ্তি ও হারানোর
চক্রচাকা ঘোরে।

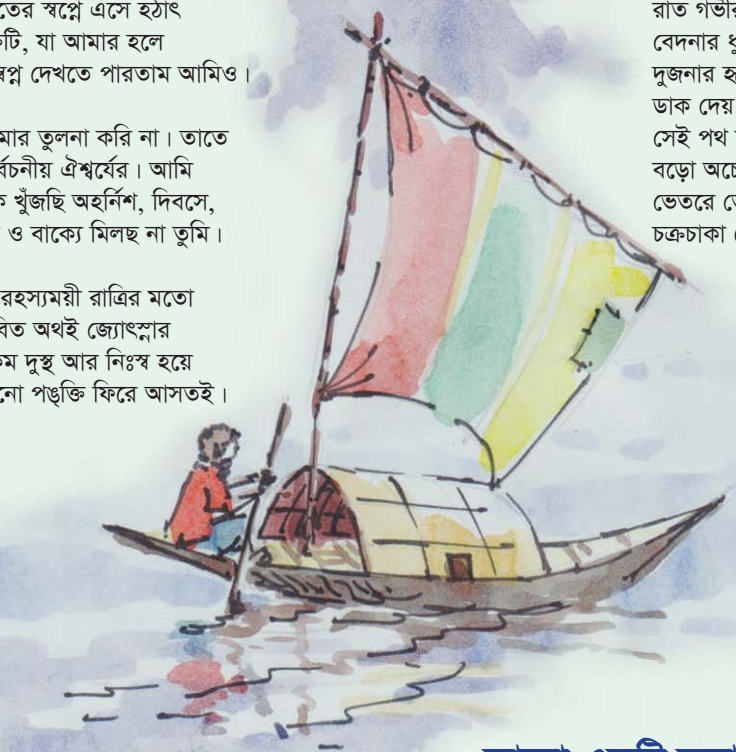

সূর্যের তাপদাহ

বাবুল তালুকদার

সূর্যের তাপদাহে মানুষ অস্থির হাহাকার
ছুটাছুটি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে
কোথাও আবার প্রচণ্ড হিমবাহ
শান্তি নেই, স্বস্তি নেই,
এ যেন এক অসহায় জীবন।

বটবৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে হাঁপায়
দীর্ঘশ্বাস ফেলে মানুষ আর মানুষ
আমিও ওদের মধ্যে একজন।

ঈশ্বরের খেলা বুঝে ওঠা বড়ো মুশকিল
আলো থেকে মুহূর্তেই অন্ধকারে ঠেলে দেয়
বৃষ্টি আর তুফানের খেলা চলে কিছুক্ষণ
আবার মুহূর্তেই পৃথিবী আলোকিত হয়
সূর্যের তাপদাহ ফিরে পায় মানুষ
প্রকৃতি নেচে ওঠে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দে
নেচে ওঠে বৃক্ষের ডালপালা
শুধু মানুষই বুঝতে পারে না
পৃথিবীর রহস্যের খেলা।

আরো একটি সকালের আয়োজন

জাকির আবু জাফর

হোক না আরো একটি সমূহ সকালের আয়োজন
আরো একটি রৌদ্রময় শিশিরের সান্নিধ্য
কেবল কোমল কেবল আরাম কেবল আনন্দের
বিপুল বিস্ময়ে উদ্‌বোধিত কোনো ক্ষণের নিয়তি

হোক হোক আরো কোনো সন্ধ্যার আকাশ নির্মিত
হোক রাত্রির রহস্যে রোপিত কোনো নক্ষত্র উদ্যান
যেখানে জাগ্রত থাকে আলোর নদীরা
তুমি সেই নদীর কোনো হৃদয় থেকে
বেছে নাও স্বপ্নের জল
যা দিয়ে ধুয়ে দেবে তোমার মনোবৃক্ষের
সমস্ত পাতার শরীর

জগতের জন্য হয়ে যাও এক আশ্চর্য উপমা
যাকে ঠোঁটে করে ফিরবে পৃথিবীর সমস্ত পাখিরা
যে বাতাসে ভেঙে যায় পাখির পাখা
তাকে পুরে দাও কবিতার হৃদয়ে
তোমার কবিতা দুলে ওঠুক আনন্দের গহনে

আকাশ যেমন সকলেই দেখে
তোমাকেও তেমন করে দেখুক সবাই।

দীর্ঘশ্বাস শুনি

শাহরিয়ার নূরী

ফুলের পাশে ও কার ছবি
বলল সবাই আরে
ওই তো পাখি দুলছে

তাহলে কিচিরমিচির কোথায় পাই
দেখেছ ঝোপ নাকি মনের রঙে ছাই
হতবিহ্বল মেয়েটি– এলাম মাত্রই
যদিও কিছু দেখি না
দেখতে তুমি যেও না
বলে উঠল রুক্ষ দঙ্গল ছেলেমেয়ে

মালি এল ঢিলা বেশে
তবু বল যদি ভাই দেখেছিলে যাই
কেন এলে এই কাজে বুঝে নিতে চাই
কথা শুনে হাসে মালি– সব জানে মনে
এখানে ছিলেন জানো সেই কবিরাজ
দিঘির পাশে জমির তিনি মহারাজ
পাখি ভরা তার জোত ছিলেম রায়ত
মাটির ওপর পড়া দেখি মহৎ দেহের
বাড়ি হলো ফুল হলো এখানে এলাম
শিক্ষকের দেহে সার হওয়া বাগান
ফুল পাখি গাছ ওড়ে সুবাস সুনাম
রোজ বেশ চলে ফল গাছ গুনাগুনি

তোমরা যাদের ফুল বলো
আমি শুধু দীর্ঘশ্বাস শুনি।

তবু স্বপ্ন আছে

জাকির হোসেন চৌধুরী

সেদিন রাতে রিমঝিম ব্যাকুল জোৎস্নায়
স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন এখন মন্থর বেগবন্ধ।
তবু স্বপ্ন ছিল। ছিল আকাঙ্ক্ষার গান।
তবু স্বপ্ন আছে।

স্বপ্নরা শাখায় শাখায় দোলে-
হরিৎ পাতার মুখে হলুদ নিশ্বাস টানে-
রাতের বিবশে অন্ধকারে হাঁচি দেয়,
স্বপ্ন আজ পিপাসায় আলোর প্রপাত
চায় শুধু।

স্বপ্নরা হামাগুড়ি দিতে জানে সমতল থেকে
বন্দর শিলায় শিলায় ফেরে
বিদ্যুৎ লতার মতো দ্রুত ছুটে চলে,
বাতাসের বাজি ফোড়ে নিলাভ নিলয়ে।
এইভাবে স্বপ্নদের দিন কাটে,
পুরানো হয় স্বপ্নদের মোহন কবচ।

রিমঝিম ব্যাকুল জোৎস্নায় স্বপ্নরা
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তবু স্বপ্ন ছিল। ছিল আকাঙ্ক্ষার গান।
তবু স্বপ্ন আছে।

তখন থলের বিড়ালও বাঘ হয়ে যেত

সোহরাব আহম্মেদ

এত কিছুর পরও পর হওনি
ঘর করনি ভিন্ন
ছিন্ন হওনি। বিপদ ঘনীভূত
হওয়ার পরও
ঘরোয়া থেকেছ পরোয়া করনি
ঘর দাহকারী হনুমানের উপদ্রব।
কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্যেও
ঘরের সুপ্ত ভালোবাসা
ফুটিয়ে তুলেছ,
সে কারণে ঘরে আগুন লাগেনি!
সুতা ও পশমের বদলে
ভালোবাসার তন্তু দিয়ে
তৈরি করে নিয়েছ জীবন
না হলে ডাকঘরে কষ্টের চিঠি
পোস্ট হয়ে যেত,
তখন থলের বিড়ালও বাঘ হয়ে যেত!

জীবন বদলে যায় ভালোবাসার ছন্দে

নাহার আহাম্মেদ

কাশের বনের ধার ঘেঁষে যে
ছোট্ট বুনো পথ,
ছিল সেদিন হৃদয় মেতে
থামল প্রথম সেই খানেতে
ভালোবাসার রথ।
লজ্জাবতী লাজুক লতা
হলাম যে সেই ক্ষণে,
হৃদয় আমার আকুল করে
আবেগ এসে জড়িয়ে ধরে
একান্তে নির্জনে।
প্রজাপতি মনটা নাচে
জলের নূপুর পরে,
ঝিরিঝিরি সুরের দোলায়
ঝরনাধারা ঐ বয়ে যায়
আমায় পাগল করে।
ফাগুনের ঐ পালকি চড়ে
কৃষ্ণচূড়া আসে,
পরায় নতুন প্রেমের চোলি
আনন্দে আজ খেলব হোলি
শাপলা দিঘির পাশে।
কে বলে প্রেম সর্বনাশী
মিথ্যে স্বপ্ন দেখায়,
ছন্দ তোলে হৃদয় বনে
আসে যদি মধুর ক্ষণে
জীবন বদলে যায়।
প্রেমের ঘরে লাগিয়ে তালা
ভুল করো না আর,
ভালোবাসা ফিরে যাবে
তখন কি আর কাছে পাবে
মধুর পরশ তার।

জানতেও পারবে না

নির্মল চক্রবর্তী

তোমার মধুর হাসি কিংবা
স্বর্গীয় চিন্তার অনুপম রাজ্যে
ওরা তাকাবে না
ওদের চাই কেবল শরীর

অথচ যারা তোমার ঘনিষ্ঠ আপন
তাদের তুমি চেন না, তাদের
তুমি ভস্ম করতে চাও, আপন
কটাক্ষে দিতে চাও থামিয়ে।

তুমি ক্রমশ ক্যানভাসের বাইরে
চলে যাচ্ছ, তোমার
পথ চলা নিস্তেজ হয়ে আসছে
এভাবে একাকী যেও না, চলে এসো
ওরা তোমাকে লোল জিহ্বা অগ্নিকুণ্ডে
ছুড়ে ফেলবে। তুমি জানতেও পারবে না।

সেই শহরে মেঘ জমেছে

বোরহান মাসুদ

যাকে নিয়ে লিখতে বসে
খুব সহজে পার হয়ে যায় রাত
খুব সহজে সে বলে দেয়
তোমার লেখা কবিতা আর
ভাল্‌লাগে না। ফালতু ওসব।

যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে
থরে থরে আকাশ কেটে
পূর্ণ চাঁদে ঘর বানালাম,
খুব সহজে বলল হেসে
ধুত্তোরি ছাই স্বপ্ন ওসব।

যাকে নিয়ে মনের মাঝে
শূন্য স্থান... হঠাৎ করে
সেই শহরে মেঘ জমেছে
মেঘের কোলে অন্ধ শহর
শূন্য এখন। দগ্ধ মনে।

সুতাকাটা ঘুড়ি

সাদিয়া সুলতানা

হাত বাড়ালেই কী আকাশ ছোঁয়া যায়
ঠোঁট রাখা যায় নোনা জলে।

পথ হারালে গহীন বনে
হাওই মন শূন্য ওড়ে।
হেমন্তের এই সাঁঝ বেলাতে
তৃষাতুর বুনো বাতাস, কেঁদে ফেরে

ভয়ংকর কোন সুন্দরের ডাকে
বৃষ্টি-গাছে আঁকি-বুকি সবুজের পদাবলি।

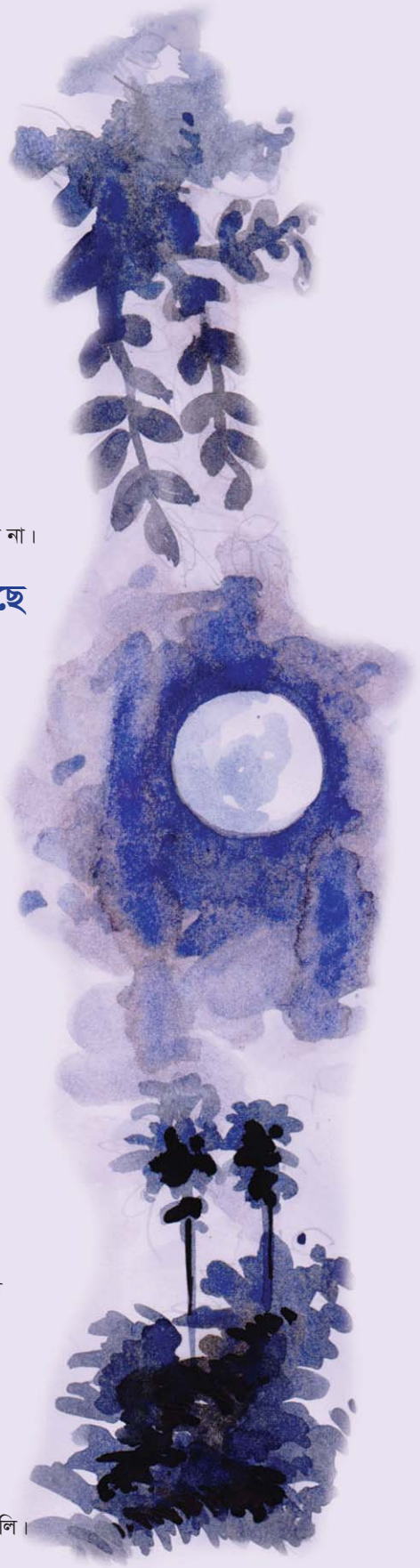

প্রাণ পতনের শব্দাবলি

হাসানাত লোকমান

কতটা আর কষ্ট দিবি
এই জীবনে
রকমারি কষ্ট আছে লাল, নীল, সাদা, কালো
বুকের কাছে
কতটা আর দুঃখ দিবি!
দুঃখ আমার চির চেনা অনামিকা অচিন পাখি
দুঃখগুলো ফুলের মতো গেঁথে রাখি
কষ্ট কাজল চোখে মাখি
জীবন আঁকি
সূর্যকলি
প্রাণ পতনের শব্দাবলি।
দুঃখগুলো ছড়িয়ে থাকে ধানের মতো
হৃৎচাতালে
ফুটতে থাকে খৈয়ের মতো কষ্টগুলো
পুড়তে থাকে হৃদয় আমার সারাবেলা
অবহেলা
কষ্টগুলো প্রাণ পুকুরে সাপের মতো সাঁতার কাটে
দাঁড়িয়ে থাকে বটতলাতে, নদীর ঘাটে...

দুঃখগুলোর গোঙানিতে ঘুম আসে না
মনদিঘিতে সোনার কলস আর ভাসে না
কষ্টগুলো কেবল কাশে দুঃখ-জ্বরে
আমার ঘরে রাতদুপুরে কান্না পড়ে
ব্যথা নড়ে, কষ্ট ঝরে
দুঃখ-কষ্ট এখন আমি রমণ করি
তুই বিহনে।
কতটা আর কষ্ট দিবি
এই জীবনে।

বৈশাখের কথা

মাইন উদ্দিন আহমেদ

আমি এখন আপনাদেরকে
দূর বৈশাখের কথা বলব
আমি পান্তা-ইলিশের
বিস্তারিত তুলে ধরব
আমি চৈত্রের উত্তাপের কথা
যথাযথ করে বলব
আমি কালবৈশাখির কথা
ঝঞ্ঝার মতো তুলব।
আপনারা বলেছিলেন বৈশাখের
নতুন সম্ভাবনার কথা
আপনারা বলেছিলেন অতীতের জঞ্জাল
বিদারণের কথা
আপনারা বলেছিলেন সমস্ত গ্লানি
ধুয়ে যাবার কথা
নিম্ন মানের মিনিকাট করা চালে
এখন ভালো ভাত হয় না।
জাটকা নিধনযজ্ঞের কারণে
ইলিশ বড়ো হয় না।
আমি এখন স্পষ্ট দেখছি
সম্পূর্ণ নতুন বৈশাখ,
গরম ভাতের সাথে খাব
চিংড়ি এবং পুঁইশাক।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ধর্মে ধর্মে বিভেদকে দূরে রাখার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ রোহিঙ্গাদের সম্মানজনক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও তাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে বিশ্বের সব দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

২৭ সেপ্টেম্বর শারদীয় দুর্গাপূজা পরিদর্শনকালে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমারকে বাধ্য করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, রোহিঙ্গারা যাতে নিজের দেশে গিয়ে থাকতে পারে, সেজন্য ওআইসি সদস্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরো বলেন, মিয়ানমার থেকে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে মুসলিম রোহিঙ্গাদের সঙ্গে অনেক হিন্দুরাও বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের প্রতিও আমাদের সহমর্মিতা থাকতে হবে। তাদের দুঃখের দিনে পাশে দাঁড়াতে হবে, সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ধর্মে ধর্মে বিভেদকে দূরে রাখতে হবে। আজ বিশ্বজুড়ে হিংসা-বিদ্বেষ আর ধ্বংস আমাদের সামনে এক ভয়াবহ অশনিসংকেত হয়ে দেখা দিয়েছে। এ হত্যা আর ধ্বংস প্রতিরোধে আমাদের ধর্মের অহিংস ও শান্তির অমিয় বাণী বিশ্বজনতার কাছে তুলে ধরতে হবে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ অক্টোবর ২০১৭ কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় আবদুল হামিদ মিলনায়তনে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় করেন –পিআইডি

রাজনৈতিক নেতাদের জনবান্ধব আচরণের আহ্বান

৮ অক্টোবর কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, ভোটারদের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

তিনি বলেন, প্রকৃত রাজনৈতিক নেতার আচরণ সর্বদাই জনবান্ধব। জনগণ তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আপনাদের নির্বাচিত করেছে এবং আপনাদের অবশ্যই তা মনে রাখতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আপনি জনপ্রতিনিধি এমনকি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কিংবা এমপি হিসেবে নির্বাচিত হন তাহলে আপনার কিছু দায়িত্ব চলে আসে এবং আপনার হাতে জবাবদিহি থাকে। আপনার ইতিবাচক মনোভাব তাদের রাজনীতিতে আকর্ষণ করে।

তিনি আরো বলেন, তৃণমূলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধভাবে ভোটারদের প্রতি ন্যায়বিচার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

একনেকে ১০ প্রকল্প অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ অক্টোবর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ১০ প্রকল্পের অনুমোদন দেন। এসব প্রকল্পে ব্যয় হবে ৫ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা। এছাড়া তিনি ঢাকা শহর সংলগ্ন এলাকার দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ অক্টোবর তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দেশের তরুণদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেন।

ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ অক্টোবর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে 'ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে' প্রকল্প অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আব্দুল্লাপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল হয়ে নবীনগর মোড় এবং ইপিজেড হয়ে চন্দ্রা মোড় পর্যন্ত ২৪ কি.মি. এলিভেটেডওয়ে নির্মাণ করা হবে।

বস্তিবাসীদের জন্য প্রথমবারের মতো ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মিরপুর-১১ নম্বরে বস্তিবাসীদের জন্য প্রথমবারের মতো ১০ একর জমির ওপর ১০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশে কেউ আবাসনহীন থাকবে না। আমাদের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য আমরা আবাসন ব্যবস্থা করব। আর এটা জাতির পিতার নির্দেশ।' তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা বাংলাদেশকে আরো এগিয়ে নিতে চাই এবং দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।'

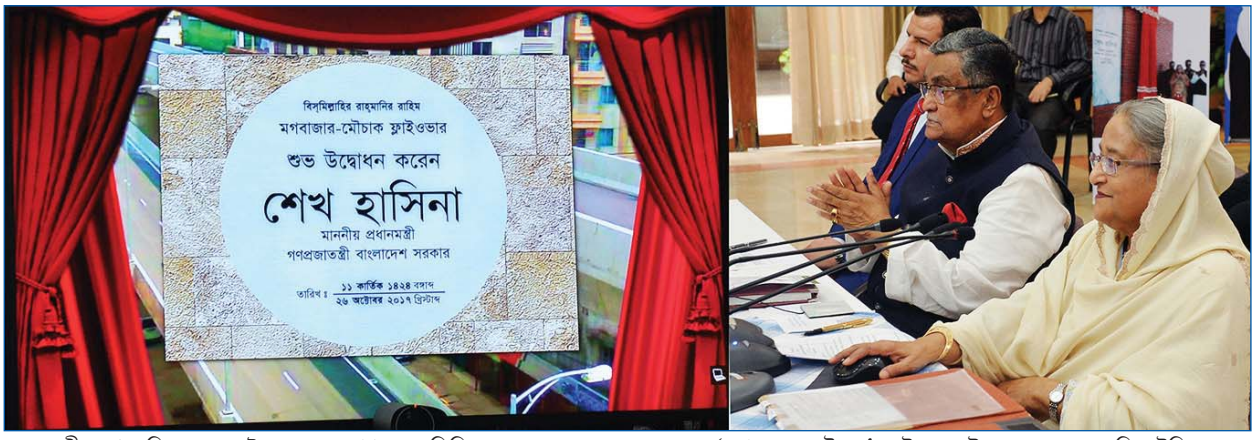

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ অক্টোবর ২০১৭ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকার 'মগবাজার-মৌচাক' ফ্লাইওভার উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের সময়ে নির্মিত ফ্লাইওভারের উদ্‌বোধন এবং নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী ফ্লাইওভার নির্মাণে সম্পৃক্ত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান এবং দেশের উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন এবং পুষ্টিমান বজায় রাখার আহ্বান

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৮ অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে উন্নয়ন ধারা আয়োজিত 'খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থায় বিনিয়োগ' শীর্ষক এক সেমিনারে বলেন, সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও এগোনো সম্ভব।

মন্ত্রী বলেন, কৃষিকে মুক্তবাজারে ছেড়ে দিলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও সচেতন অর্থায়ন করতে হবে। যদিও বাংলাদেশের কৃষি সম্পূর্ণ একটি বেসরকারি খাত। তবুও সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা বা ভরতুকি ছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা সম্ভব নয়। পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব।

তিনি বলেন, আমেরিকায় এবং ইউরোপে কথিত মুক্তবাজার রয়েছে। কিন্তু তারপরও তারা বছরের পর বছর কৃষি খাতে ভরতুকি দিয়ে আসছে। উৎপাদন, চাহিদা, জোগান এবং মূল্য জনগণের হাতের নাগালে রাখার জন্য প্রতিবছর তারা এই ভরতুকি দিচ্ছে। আমাদেরও তা করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, কৃষি খাতে ভরতুকি মানে সরকার সচেতনভাবে অর্থায়ন অথবা বিনিয়োগ করবে। এই বিনিয়োগের ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে না। এরজন্য ৫-৬ বছর অপেক্ষা করতে হবে। দানা বা শস্য জাতীয় ফসল উৎপাদনে সচেতন অর্থায়নের কারণে আজ আমরা এসব ফসলে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যায়।

এ সময় গ্রামীণ উন্নয়নের বিষয়ে তিনি বলেন, গ্রামীণ উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়ন প্রয়োজন। এছাড়া সমৃদ্ধশালী কৃষি ব্যবস্থারও প্রয়োজন। তাছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করতে হবে এবং পুষ্টিমানও বজায় রাখতে হবে। ফলে কৃষিবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং এতে গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

ইন্টারনেট মানবাধিকারের অংশ

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১১ অক্টোবর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহায়তায় খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ আয়োজিত 'বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং খাদ্য অধিকার' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। খাদ্য ও ইন্টারনেটের অধিকার মানবাধিকারের অংশ। এ দুটি অধিকার আইন হিসেবে প্রণয়নের

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৮ অক্টোবর ২০১৭ জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থায় বিনিয়োগ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

দাবি রাখে। আর পর্যাপ্ত পুষ্টি সংবলিত খাদ্য নিরাপত্তাই ক্ষুধামুক্তির পথ।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় দারিদ্র্যের কোনো স্থান নেই। ক্ষুধা-দারিদ্র্য থেকে স্থায়ী মুক্তির জন্য যে সমৃদ্ধি প্রয়োজন, তা অর্জনে জাতিকে দর্শনগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সেমিনার থেকে ১১ দফা সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে– চালের দাম কমানো, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা নিশ্চিত করা, অতি দরিদ্র ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা, কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, হাওরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় টেকসই পরিকল্পনা, খাদ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার দারিদ্য ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি। **প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন**

পবিত্র আশুরা পালিত

১ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'পবিত্র আশুরা'।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস।

স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অক্টোবর মাসকে 'স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস' হিসেবে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে ৭ অক্টোবর ২০১৭ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় –পিআইডি

বিশ্ব বসতি দিবস

২ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব বসতি দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'গৃহায়ন নীতিমালা সাধ্যের বসতি'।

বিশ্ব শিশু দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে 'বিশ্ব শিশু দিবস' ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৭'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'শিশু পেলে অধিকার, খুলবে নতুন বিশ্বদ্বার'।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস

❑ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর উদ্যোগে দেশব্যাপী 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির জন্য উৎপাদনশীলতা'।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস

৫ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচিতে পালিত হয় 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'স্বাধীন চিত্তে শিক্ষাদান, শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন'।

বিশ্ব হাসি দিবস

৬ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব হাসি দিবস'।

গণসংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী

৭ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগদানের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে ২০ দিনের সফর শেষে দেশে ফেরেন এবং বিমানবন্দর সড়কে তাঁকে স্বাগত জানান নেতা-কর্মী ও হাজার হাজার মানুষ।

জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস

৯ অক্টোবর : বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস'। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সারচার্জের অর্থে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হোক'।

বিশ্ব স্তন ক্যানসার সচেতনতা দিবস

১০ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব স্তন ক্যানসার সচেতনতা দিবস'। মূলত অক্টোবর মাসকে স্তন ক্যানসার সচেতনতার মাস হিসেবেই পালন করা হয়।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য'।

বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস

১২ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস'।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস

১৩ অক্টোবর : 'কন্যাশিশুর জাগরণ, আনবে দেশের উন্নয়ন'– এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ অক্টোবর ২০১৭ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন –পিআইডি

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

❑ অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'দুর্যোগ সহনীয় আবাস গড়ি, নিরাপদে বাস করি'।

বিশ্ব ডিম দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অক্টোবরের দ্বিতীয় শুক্রবার নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ডিম দিবস'।

বিশ্ব মান দিবস

১৪ অক্টোবর : বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)-এর উদ্যোগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব মান দিবস' পালিত হয়। মান দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'নান্দনিক নগরায়নে মান'।

বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস

১৫ অক্টোবর : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস'।

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস

❑ সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস'।

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'সাদাছড়ির নিশ্চিত ব্যবহার, এ দিবসের অঙ্গীকার'।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

১৬ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি - ২০১৭' নামের নীতিমালা অনুমোদিত হয়। এছাড়াও বৈঠকে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৭-এর খসড়াও অনুমোদিত হয়।

বিশ্ব খাদ্য দিবস

❑ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস'। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'অভিবাসনের ভবিষ্যৎ বদলে দাও, খাদ্য নিরাপত্তা ও গ্রামীণ উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াও'।

একনেক সভা

১৭ অক্টোবর : এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন-এর সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় 'মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ ও স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পসহ ৫ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকার ১০টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস

২২ অক্টোবর : সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সাবধানে চালাবো গাড়ি, নিরাপদে ফিরব বাড়ি'।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

২৩ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশের তরুণদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতির পিতা এবং কূটনীতিবিদ বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীনতা। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। সম্মোহনী বাগ্মিতা, সহজ-সরল-দরাজ মন অথচ আপোশহীন সংগ্রামী নেতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর দক্ষ কূটনীতির মাধ্যমে বিশ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ইতিহাসে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়েছেন জাতিসংঘে।

স্বাধীনতার মাত্র ৩ মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনী ভারতীয় সৈন্যদের ফিরিয়ে দিয়েছেন ভারতে, যা পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। গণপরিষদের মাধ্যমে দিয়েছেন সংবিধান। স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের। জাতিসংঘের সদস্য, কমনওয়েলথ-এর সদস্য, জোট নিরপেক্ষ দেশের সদস্য

হয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর পরই। বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ওআইসি-র সদস্যপদ নিয়েছিলেন পাকিস্তান সফরে গিয়ে। সৌদিআরব ছাড়া আরব দেশগুলোর স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন কূটনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে। মাত্র তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বোমোদিন, সেনেগালের প্রেসিডেন্ট লিওপোল্ড সেনগর, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। জাপান থেকে এসেছিল ৪৫ সদস্যের বৃহৎ একটি অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদল। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর নিযুক্ত বিশেষ প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন বেশ কটি দ্বিপাক্ষিক সফরে। সদ্য স্বাধীন দেশ হয়েও যুদ্ধ-উত্তর পুনর্গঠনের মাঝে একটি নবগঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই প্রতিষ্ঠা লাভ বঙ্গবন্ধু আর তাঁর সফল পররাষ্ট্রনীতিরই পরিচায়ক। **প্রতিবেদন : মো. লিয়াকত হোসেন ভূঞা**

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বে চাল উৎপাদনে চতুর্থ বাংলাদেশ

স্বাধীনতার পর দেশে যে পরিমাণ চাল উৎপাদন হতো তারচেয়ে তিনগুণ বেশি চাল উৎপাদন হয় এখন বাংলাদেশে। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। আর এ চালের ৫৫ ভাগ আসে বোরো ধান থেকে। বাকিটুকু আসে আউশ ও আমন ধান থেকে। বিশ্বে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে এক বছরে একই জমিতে তিনবার ধান উৎপাদন হয়। এই চালই বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনে বড়ো ধরনের ভূমিকা রাখছে।

বান্দরবানের সোলার হোম সিস্টেম

বর্তমান সরকার পার্বত্য অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের স্বাবলম্বী তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে অনেক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। বান্দরবানে পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব ও অসহায় ৯২টি পরিবারের সদস্যদের মাঝে পরিবার প্রতি ১টি করে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং-এর বান্দরবানের বাসভবনে এই সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং-এর বান্দরবানের বাসভবনে গরিব ও অসহায় পরিবারের সদস্যদের মাঝে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ করা হয়

বিনামূল্যে সরকারি আইনি সেবা

যেসব ব্যক্তির বার্ষিক আয় সরকারের দেওয়া সময়ে নির্ধারিত আয়কর সীমার নিচে হবে তারা বিনামূল্যে সরকারি আইনি সহায়তা পাবেন। এ হিসাবে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লাখ ৫০ হাজার, নারী ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩ লাখ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪ লাখ এবং গেজেটভুক্ত যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকার নিচে বার্ষিক আয়ভুক্ত ব্যক্তি বিনামূল্যে সরকারি আইনি সহায়তা পাবেন। ৮ অক্টোবর আইন, বিচার, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (এনএলএসও)-এর জাতীয় পরিচালনা বোর্ডের ৩৫তম সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

দুই টাকার নতুন কারেন্সি

দুই টাকার নতুন কারেন্সি মুদ্রণ করা হয়েছে। ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস থেকে এই নোট ইস্যু করা হয়েছে। কারেন্সি নোটটির রং, পরিমাণ, জলছাপ, ডিজাইন, অন্যান্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য বর্তমানে প্রচলিত নোটের অনুরূপ হবে। পূর্বে প্রচলিত থাকা দুই টাকা মূল্যমানের কাগুজে নোট ও ধাতব মুদ্রা একই সাথে চালু থাকবে।

স্বাস্থ্য সারচার্জ নীতি অনুমোদন

তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকজনিত অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে অর্থ ব্যয় করার বিধান রেখে 'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭'-এর খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ১৬ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০১৪ সালে তামাকজাত পণ্যের ওপর ১ শতাংশ হারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করে সরকার। সারচার্জ থেকে প্রতিবছর প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা আদায় হয়। এ অর্থ আগেও ব্যয় হতো। তবে এখন এ অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। তবে এ অর্থ পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছিল না। এখন তামাক নিয়ন্ত্রণের ১৪টি খাতে এই টাকা ব্যবহার করা হবে।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতি সম্মেলন

৩০০০ কোটি টাকা রোহিঙ্গা সহায়তা ঘোষণা

বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য আরো ২ হাজার কোটি টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। ২৩ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘ আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এ নিয়ে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত 'প্রতিকার পরিকল্পনা' তহবিলের পাঁচ-ষষ্ঠাংশ অর্জিত

বাংলাদেশে সফররত মালয়েশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী আহমেদ জাহিদ হামিদি ১৬ অক্টোবর কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন

হলো। সংকট শুরুর পর প্রথম ৬ মাসের জন্য এই তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কুয়েতের আহ্বান ও সহযোগিতায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ সহায়তার কথা জানা যায়।

কক্সবাজারে মালয়েশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশে সফররত মালয়েশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী আহমেদ জাহিদ হামিদি ১৬ অক্টোবর কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে জানান, বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের নিরাপদে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে তিনি বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগকে জোরালোভাবে সমর্থন করেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফেরতের বিষয়ে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে মালয়েশিয়া কাজ করবে। মালয়েশিয়া রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ক্যাম্প এলাকায় একটি ফিল্ড হাসপাতাল করবে বলেও তিনি জানান।

'বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে যে মানবিকতা দেখিয়েছে, তা বিশ্বের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে' বলেও মত ব্যক্ত করেন আহমেদ জাহিদ হামিদি।

নেপিদোতে সুচির সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ২৫ অক্টোবর মিয়ানমার সফর করেন। মিয়ানমারের রাজধানী নেপিদোতে অং সান সুচির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এক ঘণ্টার এ বৈঠকে সুচি জানান, কফি আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে তার সরকার কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পাঁচটি প্রস্তাব এবং কফি আনান কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতেই বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত নেওয়া প্রক্রিয়া শুরু হবে। ১০ সদস্যের দল নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমার সফর করেন।

ইইউ চায় আনান কমিশন সুপারিশের বাস্তবায়ন

মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার বাস্তবায়ন চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তাদের দাবি, অবশ্যই নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৮ অক্টোবর ঢাকার একটি হোটেলে কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের সংগঠন ডিক্যাবের আলোচনা অনুষ্ঠান 'ডিক্যাব টক'-এর বক্তব্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেলিগেশন প্রধান ও রাষ্ট্রদূত রেনসে টিরিংক এ কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ইইউ সম্প্রতি মিয়ানমারের সেনা কর্মকর্তাদের ওপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তা রোহিঙ্গাবিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতীকী ব্যবস্থা। রোহিঙ্গা সংকট মিয়ানমারকে সমাধান করতেই হবে বলেও তিনি জানান।

শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কোর ভাইস প্রেসিডেন্ট পুনঃনির্বাচিত

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর ৩৯তম সাধারণ সম্মেলনের জন্য পুনরায় ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ইউনেস্কো সাধারণ সম্মেলনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০১৭-১৯ মেয়াদের দায়িত্ব পালন করবেন। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন– মরক্কোর জহুর আলাওই। প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে ৩০ অক্টোবর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। **প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন।**

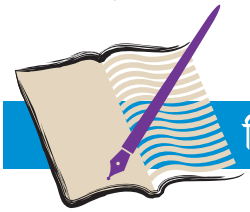

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখার আহ্বান

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ৩ অক্টোবর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় মন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখার দায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত তাদের যথাযথভাবে তা পালনের মাধ্যমে জাতিকে জাগ্রত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেখানে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর যেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া সম্ভব নয় সেখানে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি ২০১৮ সালের জুনের মধ্যে সকল জরাজীর্ণ বিদ্যালয় মেরামত করে শিক্ষা উপযোগী শ্রেণিকক্ষ নিশ্চিত করার এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল বিদ্যালয়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দ্রুত তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। এছাড়া ঢাকা শহরের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় দৃষ্টিনন্দন করার বিষয় সভায় আলোচিত হয় এবং ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন নভেম্বর ২০১৭-এর মধ্যে শেষ করার পরামর্শ দেন।

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন পাস

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৫ অক্টোবর সিরডাপ মিলনায়তনে 'ড্রাফট ট্রাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ : ২০১৭-২০৩০' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আওতাধীন 'হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (হেকেপ)'-এর উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় মন্ত্রী দেশের উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষা কার্যক্রমে বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনার ঘোষণা দেন। ২০৩০ সাল নাগাদ উচ্চশিক্ষার জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি আরো বলেন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন পাস হয়েছে এবং উচ্চশিক্ষা কমিশনও গঠন করা হবে।

কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে পাঁচ টাস্কফোর্স গঠন

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৬ অক্টোবর সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) উন্নয়ন বিষয়ক এক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় মন্ত্রী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৩ অক্টোবর ২০১৭ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'Stipend Compliance and Management' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তৃতা করেন –পিআইডি

এর গুণগত মানোন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার, এবং কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তিনি নতুন প্রজন্মকে ভবিষ্যতে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন এবং সভায় বাংলাদেশে টিভিইটি উন্নয়নে ৫টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এ টাস্কফোর্সগুলো টিভিইটি'র উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীজন এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৩ অক্টোবর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে 'স্টাইপেন্ড কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড মেনেজমেন্ট' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় মন্ত্রী বলেন, কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে তরুণরা দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। দক্ষতা অর্জন করতে পারলে সারা পৃথিবীতেই এদেশের তরুণদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তিনি আরো বলেন, দক্ষতা অর্জন করতে না পারলে উচ্চশিক্ষার সনদ নিয়েও বেকারত্বের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। দক্ষতাবিহীন শিক্ষা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ।

শিক্ষকগণ চিন্তা-চেতনার ধারক

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ১৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা জাতির জ্ঞানের গতিকে বেগবান করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। আদর্শিকতা ও মূল্যবোধের দ্বারা শিক্ষকরা সবার কাছে সম্মানের পাত্র, তারা উন্নত চিন্তা-চেতনার ধারক। তিনি শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ও আদর্শের শিক্ষা দিতে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। বিশ্বে মানবসম্পদ হিসেবে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামী দিনের নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন দক্ষ যুবসমাজ গড়ার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে বেগবান করার আহ্বান জানান।

শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ১৪ অক্টোবর জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে কিন্ডার গার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত কিন্ডার গার্টেন শিক্ষক সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, মানসম্মত শিক্ষা ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ক্লাসের প্রতিটি শিশুকেই নিজের সন্তান ভেবে যত্ন নিয়ে পাঠদান করাতে হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, কিন্ডার গার্টেন হচ্ছে শিশুদের বাগান। বাগানে গাছকে যেমন পরিচর্যা করতে হবে, শিশুদেরও সেভাবে পরিচর্যা দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করতে হবে। **প্রতিবেদন: মো. সেলিম**

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

অটিজমের ওপর ফেলোশিপ কর্মসূচি উদ্‌বোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬ অক্টোবর ২০১৭ অটিজমের ওপর কোইকা ফেলোশিপ কর্মসূচির প্রিপারেটরি কোর্সের উদ্‌বোধন করেন বিশ্ববরেণ্য অটিজম বিশেষজ্ঞ, বিশ্ব অটিজম চ্যাম্পিয়ন, ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি কমিটি অন অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার-এর চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল। তাঁর নেতৃত্বে

১৬ অক্টোবর ২০১৭ অটিজমের ওপর কোইকা ফেলোশিপ কর্মসূচির প্রিপারেটরি কোর্সের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল

এই প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হয়। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে তিনি অটিজম আক্রান্ত শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলো গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী সকলকে সচেতন করার পরামর্শ দেন।

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা) বাংলাদেশ অফিসের সহায়তায় এই কর্মসূচির আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা) সেন্টার। কোইকা বাংলাদেশের অটিজমের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কোরিয়াতে এ ধরনের ফেলোশিপ কর্মসূচি পরিচালনা করেছে।

প্রতিবেদন : হাছিনা আক্তার

শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ

একটি বাড়ি একটি খামার

সারা দেশে ৪০ হাজার ৩৩৩টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০ বিশেষ উদ্যোগের একটি হচ্ছে 'একটি বাড়ি একটি খামার'। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে গ্রাম সমিতির মাধ্যমে সংগঠিতকরণ, সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান, সদস্য সঞ্চয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ অর্থ বোনাস প্রদান, সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের মানব সত্তাকে শাণিতকরণ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রমসহ বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে সারা দেশে ৪০,৩৩৩টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে সমিতিভুক্ত পরিবারগুলোকে ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এ ঋণের অর্থ ব্যবহার করে সদস্যরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। পরিবীক্ষণে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ৮টি বিভাগের ১৬টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নের ৩২টি গ্রাম সমিতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

উপবৃত্তি পাচ্ছে চট্টগ্রামের পৌনে ৩ লাখ শিক্ষার্থী

মহানগরীসহ চট্টগ্রামের ১২ পৌরসভার ৬৬৪ প্রাথমিক স্কুল ও মাদ্রাসার আরো ২ লাখ ৭৮ হাজার ২০৫ জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় এসেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া রোধে প্রাক প্রাথমিক, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির সব খুদে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আওতায় এনেছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও একনেক চেয়ারপারসনের সভাপতিত্বে ২৯ আগস্ট শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক সভায় এ উপবৃত্তি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প - ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়ে একনেক সারা দেশের জন্য ৬৯২৩ কোটি ৬ লাখ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে তা কার্যকর হবে। **প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম**

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে সরকারের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ

হোটেল সোনারগাঁও-এ 'Lunching Event of Capacity Building for Education (Cap ED) Programme in Bangladesh' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ইউনেস্কোর ঢাকা অফিস। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞাননির্ভর ও প্রযুক্তিভিত্তিক মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিক্ষানীতিতে এসডিজি-৪-এর কিছু কিছু বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, লক্ষ্য অর্জনে Cap ED Programme-এর মাধ্যমে কৌশলগত ও বিশেষজ্ঞ সহায়তা পাওয়া যাবে। মন্ত্রী আরো বলেন, প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বায়নের যুগে মানসম্মত শিক্ষা দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে এবং এ প্রক্রিয়াকে সফল করতে সরকার শিক্ষকদের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণও দিচ্ছে।

এসডিজি-১৬ অর্জনে প্রস্তুতি যথেষ্ট

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৬ (এসডিজি) অর্থাৎ শান্তি ও ন্যায়বিচার কার্যক্রম প্রতিষ্ঠান অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তুতি যথেষ্ট এবং বিস্তৃত। কিন্তু প্রয়োগিক ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপের কিছুটা ঘাটতি থাকায় লক্ষ্য অর্জনে বিচ্যুতি ঘটার ঝুঁকি রয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ধানমন্ডি কার্যালয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬ : দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

টিআইবি জানায়, এসডিজি'র দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট চারটি লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গবেষণাটি করা হয়েছে।

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে 'জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক বৈঠকে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র এসডিজি গ্রহণ করে। ২০৩০ সালের মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলো এটি বাস্তবায়ন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় পর্যায়ে শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট হচ্ছে

জাতীয় পর্যায়ে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটি শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। ২০ সেপ্টেম্বর অনুমোদনের পর ১০০০ শয্যার প্রস্তাবিত এ হাসপাতালের জন্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রাজধানীর পূর্বাচলে ৩০ একর জায়গাজুড়ে এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

দেশে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল এবং ক্লিনিকের সংখ্যা অনেক। তবে এখন পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় শুধু শিশুদের জন্য বিশেষায়িত কোনো হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট নেই। জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পূর্বে দেওয়া নির্দেশনার আলোকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিএসএমএমইউতে ৬টি নতুন বিভাগ চালু

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) আরো ছয়টি নতুন বিভাগ ও সাতটি ডিভিশন চালু হচ্ছে। ২১ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৫২তম সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন বিভাগগুলো হচ্ছে– অবস অ্যান্ড গাইনি বিভাগের অধীন রিপোডাক্টিভ এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড ইনফার্টিলিটি, গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি, ফিটো মেটারনাল মেডিসিন, সার্জারি বিভাগের অধীন হেপাটোবিলিয়ারি, প্যানক্রিয়েটিক অ্যান্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জারি, কালোরেক্টাল সার্জারি ও সার্জিক্যাল অনকোলজি।

স্বাস্থ্যসেবায় চালু হচ্ছে নৌ অ্যাম্বুলেন্স

পায়রা সমুদ্রবন্দরসহ আশপাশের বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের মানুষের কাছে দ্রুত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে চালু হচ্ছে নৌ অ্যাম্বুলেন্স। একই সঙ্গে চালু হচ্ছে নৌ ফায়ার সার্ভিস। এ দুটির নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে রামনাবাদ নদী তীরবর্তী গলাচিপা উপজেলা সদরে। সম্প্রতি গলাচিপা উপজেলা সদরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্মসচিব এ তথ্য জানান।

৫ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ হবে

৩৯তম বিসিএস হবে চিকিৎসকদের জন্য 'বিশেষ বিসিএস'। এতে প্রায় ৫ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ৩৯তম বিসিএস-এ ৪ হাজার ৫৪২ জন সহকারী সার্জন ও ২৫০ জন সহকারী ডেন্টাল সার্জন নেওয়া হবে। এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

অ্যাপে মিলবে ক্যানসার প্রশমন সেবা

ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর শেষ দিনগুলোতে কী সেবা প্রয়োজন সে বিষয়ে পরামর্শ মিলবে 'এজি প্যালিয়াটিভ ফেয়ার' নামের একটি স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশনে (অ্যাপ)। *আমাদের গ্রাম* ক্যানসার কেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এই অ্যাপ তৈরি করেছে।

এই অ্যাপে রয়েছে একটি 'উপসর্গ স্কেল'। যে স্কেলটি ০-১০ নম্বর ভাগ করা হয়েছে– নেই, মৃদু, মাঝারি, তীব্র, এমন চার ভাগে। রোগী তাঁর ব্যাথা, ক্লান্তি, উদ্বেগ, বিষণ্নতা, ক্ষুধা, ঘুমের মতো ১২টি বিষয়ে তথ্য প্রদান করলে 'উপসর্গ স্কেলে' চিকিৎসক দেখতে পাবেন রোগীর অবস্থা সম্পর্কে। আর সে অনুযায়ী পরামর্শ দেবেন চিকিৎসক।

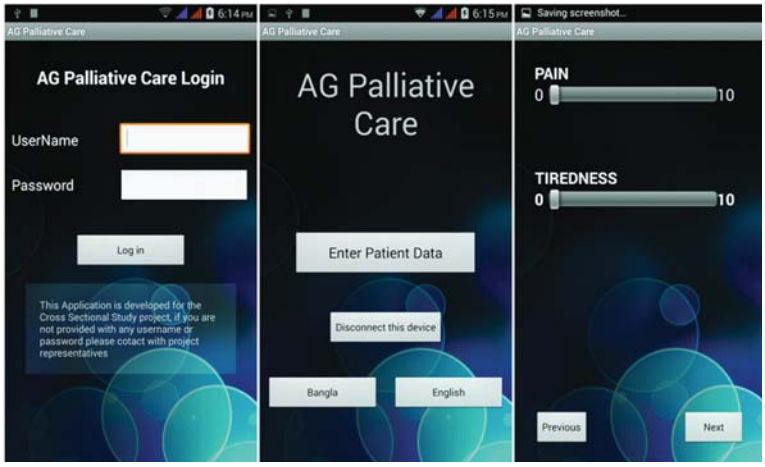

চিকিৎসকদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনে চাকরিচ্যুতির নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। ১৬ অক্টোবর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সরকারি হাসপাতালে সেবার মানোন্নয়ন সংক্রান্ত এক সভায় সভাপতিত্বকালে তিনি এ নির্দেশ দেন।

যে চিকিৎসক বিনা অনুমতিতে হাসপাতালে সময়মতো উপস্থিত থাকবেন না তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে প্রয়োজনে বরখাস্ত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন মন্ত্রী। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত না করতে পারলে বিভাগীয় পরিচালক, সিভিল সার্জন বা দায়ী হাসপাতাল সুপারভাইজারদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

যানজট নিরসনে মেট্রো রেল, ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাসবিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে

ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে বর্তমান জনবান্ধব সরকার পাঁচটি মেট্রো রেল, ছয়টি ফ্লাইওভার ও ১৫টি আন্ডারপাসবিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। পাঁচ মেট্রো রেলের মধ্যে একটির কাজ ইতোমধ্যে ২০% শেষ হয়েছে। মেট্রো রেলের পাঁচটি রুটের মধ্যে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকা গণপরিবহণ কোম্পানির তত্ত্বাবধানে এই কাজ চলছে। প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা।

উত্তরার দিয়াবাড়ী থেকে মিরপুর হয়ে আগারগাঁও পর্যন্ত রেলপথের প্রথম অংশ ২০১৯ সালের মধ্যে চালু করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা আশা করছেন।

দুটি বিআরটি নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে আরএসটিপিতে। তারমধ্যে গাজীপুর থেকে বিমানবন্দর সড়ক, মগবাজার, শান্তিনগর, গুলিস্তান হয়ে ঝিলমিল পর্যন্ত হবে বিআরটি-৩। এ অংশের মধ্যে গাজীপুর-বিমানবন্দর সড়ক অংশের কাজ শুরু হয়েছে। এ অংশে উত্তরায় হাউস বিল্ডিং থেকে টঙ্গী চেরাগ আলী পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার ও ১০ লেনের টঙ্গী সেতু নির্মাণ কাজ শুরুর পথে। ১৯ অক্টোবর চীনের জিয়াংসু প্রোভিনশিয়াশ ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে চুক্তি সই হয়েছে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ৯৩৫ কোটি টাকা। ফ্লাইওভারটি সাড়ে তিন কিলোমিটার ও ছয় লেনের হবে এবং এক কিলোমিটার হবে দুই লেনের।

বিআরটি-৩-এর বাকি অংশ বিমানবন্দর সড়ক-ঝিলমিল অংশের বিস্তারিত নকশা হয়েছে। বিআরটি-৭ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে আশুলিয়া পর্যন্ত।

ছয় এক্সপ্রেসওয়ের দুটির কাজ চলছে। মেট্রো রেল ও বিআরটি

রাজধানীতে যাত্রী পরিবহণের চাহিদার ৬৪ শতাংশ পূরণ করতে পারবে। বাকি ৩৬ শতাংশ চাহিদা মেটাতে ছয়টি এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং বেশ কিছু সড়ক নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে।

চার দফায় ৯৬ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে এক্ষেত্রে। ছয়টি এক্সপ্রেসওয়ে পূর্ণ বা আংশিক ঢাকায় থাকবে। ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা ৫৫ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ের ভৌত কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পে ব্যয় হবে ৬ হাজার ২৫২ কোটি ২৮ লাখ টাকা। এটি চালু হবে ২০১৯ সালে। ৬টি ফ্লাইওভার ও ১৫টি আন্ডারপাস বিশিষ্ট নির্মিতব্য এক্সপ্রেসওয়ের কোথাও ট্রাফিক ক্রসিং থাকবে না। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ করার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর দুই পাড়ে কাজ চলছে।

দুই দেশের শিল্পীদের আঁকা ছবির চিত্র প্রদর্শনী

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, সায়েদাবাদ ও যাত্রাবাড়ী হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হবে। এ যাবৎ প্রকল্পের অগ্রগতি ৯ শতাংশ। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল হয়ে নবীনগর মোড় ইপিজেড হয়ে চন্দ্রা মোড় পর্যন্ত ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হবে। ২৪ অক্টোবর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সরকারিভাবে এ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। **প্রতিবেদন : জাহিদ হোসেন নিপু**

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

দুই দেশের শিল্পীদের মেলবন্ধন

প্রাচ্যের রূপ-রস-গন্ধ-সৌন্দর্য ও মানুষের জীবনধারা নিয়ে চারুকলার জয়নুল গ্যালারিতে ৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয় বাংলাদেশ ও ভারতের ৫১ জন শিল্পীর যৌথ চিত্রকর্ম প্রদর্শনী। বিখ্যাতদের পাশাপাশি নবীন-প্রবীণ চিত্রকরের সৃষ্টিও ছিল এ আয়োজনে। প্রাচ্য চিত্রকলার রীতিতে আঁকা ছবিগুলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে বিচিত্র বিষয়। বাংলাদেশের ২৫ জন শিল্পীর সঙ্গে প্রদর্শনীর স্থান পায় ভারতের ২৬ জন শিল্পীর আঁকা ছবি। এ প্রদর্শনীয় আয়োজন করে ওরিয়েন্টাল পেইন্টিং স্টাডি গ্রুপ। এটি উদ্‌বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরেণ্য শিল্পী রফিকুন নবী, কবি নির্মলেন্দু গুণ, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন ও ভারতীয় শিল্পী স্বপন দাস। এ প্রদর্শনী শেষ হয় ১৪ অক্টোবর।

শামসুর রাহমান-এর জন্মোৎসব

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানের ৮৯তম জন্মদিন ছিল ২৩ অক্টোবর। এ উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরে তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ছিল শিল্পী এম এ তাহেরের আলোকচিত্র প্রদর্শনী। এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

সভাপতিত্ব করেন সাবেক সিনিয়র সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এবং স্বাগত বক্তব্য দেন জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী।

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালন স্মরণোৎসব

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালন মাজারে ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হয় সাধু, গুরু ও শিষ্যদের সঙ্গ। বাউল সম্রাট ফকির লালন সাঁইয়ের ১২৭তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এই মিলনমেলা। আনুষ্ঠানিকভাবে এ উৎসবের উদ্‌বোধন করেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাংসদ মাহবুব উল আলম হানিফ। লালন একাডেমির আয়োজনে ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠান চলে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত।

প্রয়াণের শতবর্ষে হীরালালকে শ্রদ্ধা

উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হীরালাল সেন মৃত্যুবরণ করেন ১৯১৭ সালের ২৬ অক্টোবর। আজ থেকে ঠিক ১০০ বছর আগে। প্রয়াণের শতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ হাসান ইমামের নেতৃত্বে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ অব বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত, নৃত্যকলা ও আবৃত্তি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

তিন কবিকে স্মরণ

এক মঞ্চে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সৃজনকর্ম নিয়ে 'রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত জয়ন্তী ২০১৭' শিরোনামে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর ২৩ অক্টোবর শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় সংগীত, নৃত্যকলা ও আবৃত্তি মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর এবং সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপিকা পান্না কায়সার। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই আয়োজন।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডিজিটাল বাংলাদেশ

‘ই-সার্ভিস’ আসছে তথ্য সেবায়

তথ্য মন্ত্রণালয় সুস্থ জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ই-সার্ভিসের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। নাগরিক অধিকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাল্যবিয়ে, মা ও শিশু পরিচর্যা ও যৌতুকরোধ ও পরিবেশসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় তথ্য শিগ্‌গিরই পাওয়া যাবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে।

বেসিস জাতীয় আইসিটি পুরস্কার প্রাপ্ত দেশের ৪২টি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক

১০ অক্টোবর সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তথ্য সচিব মরতুজা আহমদের সভাপতিত্বে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ‘ই-সার্ভিস রোডম্যাপ ২০২১’ অবহিতকরণ সভায় এই পদক্ষেপের কথা জানানো হয়। সভায় জানানো হয়, চলতি অর্থবছর থেকেই এই ডিজিটালকরণ শুরু হচ্ছে। যা পর্যায়ক্রমে ২০২১ সালের মধ্যে শেষ হবে। সভায় মন্ত্রণালয়ধীন সংস্থার প্রধানগণ যোগ দেন। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. জাকির হোসেন সংস্থাটির ৮০৯টি সেবা ২২৩টি ই-সার্ভিসের মাধ্যমে জনগণ ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কীভাবে সরবরাহ করা হবে তা সভায় তুলে ধরা হয়।

তথ্য ও গণযোগাযোগ ক্ষেত্রে দেশব্যাপী ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণে এটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের নতুন পদক্ষেপ। প্রতিটি সেবাই ই-সার্ভিসের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরকারি প্রচার সেবা দেশের সকলের কাছে পৌঁছানো হবে।

বেসিস জাতীয় আইসিটি পুরস্কার পেল ৪২ প্রতিষ্ঠান

প্রথমবারের মতো প্রবর্তন করা ‘বেসিস জাতীয় আইসিটি পুরস্কার’ পেল দেশের ৪২টি প্রতিষ্ঠান। ১০ অক্টোবর এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফ্‌টওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এই পুরস্কার প্রদান করে। দেশের সম্ভাবনাময় ও উদ্ভাবনী প্রকল্পের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ বলেন, যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত করা হবে। ১৭টি বিভাগে ৩৬৫টি প্রকল্পের আবেদন জমা পড়েছিল। এরপর বিভিন্ন যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয় এই ৪২টি প্রকল্পকে। এরমধ্যে চ্যাম্পিয়ন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলো হচ্ছে– সরকার ও জনগণ বিভাগে ডিভাইন আইটি, ইনক্লুইশন ও কমিউনিটি বিভাগে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এআইমস ল্যাব, স্কুল প্রকল্পে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শিক্ষার্থী প্রকল্পে বুয়েট, ই-লার্নিংয়ে রেটিওনাল টেকনোলজিস, বাণিজ্যিক শিল্প অ্যাপে এসএসএল কমার্স প্রভৃতি।

প্রবাসী সেবা কেন্দ্র চালু করেছে এটুআই

জেদ্দায় বাংলাদেশি দূতাবাসের সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কর্মসূচি ১৬ অক্টোবর চালু করেছে ‘প্রবাসী সেবা কেন্দ্র’। সৌদি আরবের মদিনা, জেদ্দা ও দাম্মামে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে এই সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

দেশে স্থাপিত ডিজিটাল সেন্টারের মতোই প্রবাসীদের জন্য এই সেবা কেন্দ্র চালু করা হচ্ছে। প্রবাসী ডিজিটাল সেন্টার থেকে সরকারি-বেসরকারি নানা সেবা পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

অবমুক্ত হলো উচ্চমাত্রার আমিষযুক্ত ব্রি-৮১

কৃষকের মাঠ পর্যায়ে চাষের জন্য অবমুক্ত করা হলো ব্রি-ধান ৮১। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ ১৫ বছর নিরলস পরিশ্রম করে উদ্ভাবন করেন ব্রি ধান- ৮১। সদ্য অবমুক্ত হওয়া এই নতুন জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন পাওয়া যাবে সাড়ে ৬ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৮ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম এই জাতটি। সদ্য অবমুক্ত হওয়া এ জাতের মাঠ প্রদর্শনী শুরু করতে সময় লাগবে আরো ৩ বছর। আর ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক হারে পাওয়া যাবে ব্রি- ৮১ ধানের বীজ।

ব্রি ধান-৮১ বোরো মৌসুমের জনপ্রিয় ও মেগা জাত ব্রি ধান-২৮’র পরিপূরক একটি জাত। প্রতিকূল পরিবেশে এর গোছাগুলো ঢলে পড়বে না। নতুন উদ্ভাবিত এই জাতটির জীবনকাল ১৪০ থেকে ১৪৫ দিন। এ জাতের এক হাজার পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২০

দশমিক ৩ গ্রাম। ব্রি ধান-৮১ জাতে অ্যামাইলোজ রয়েছে শতকরা ২৬ দশমিক ৫ ভাগ এবং এতে উচ্চমাত্রায় আমিষ রয়েছে ১০ দশকি ৩ ভাগ।

উল্লেখ্য, ১৫ বছর আগে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ইরান থেকে আমন-৩ জাতের ধান বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। তখন থেকেই ব্রি-এর বিজ্ঞানীরা এই ধান থেকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী উচ্চফলনশীল ধান তৈরির কাজ করছিলেন। বিজ্ঞানীদের তথ্য মতে, ইরান থেকে সংগৃহীত জাত আমন-৩'র সঙ্গে ব্রি ধান- ২৮'র সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে নতুন জাত ব্রি ধান- ৮১।

ব্লাস্ট প্রতিরোধী এবং জিংকসমৃদ্ধ গম উদ্ভাবন

প্রথমবারের মতো ব্লাস্ট প্রতিরোধী ও জিংকসমৃদ্ধ গম উদ্ভাবন করছেন গম গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা। বারি গম-৩৩ নামের নতুন এ জাতটি আবাদ করলে উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনি যোগান দিবে জিংকেরও। গমের ব্লাস্ট রোগ ছাড়াও নতুন এই জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। সম্প্রতি জাতীয় বীজ বোর্ড গমের নতুন এ জাতটিকে অনুমোদন দেয়।

বারি গম-৩৩'র দানায় জিংকের মাত্রা ৫০ থেকে ৫৫ পিপিএম। এর জীবনকাল ১১০ থেকে ১১৫ দিন। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২ থেকে ৪৭টি। গমের ব্লাস্ট রোগ ছাড়াও বারি গম-৩৩ পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। বিজ্ঞানীরা জানান, তাপসহিষ্ণু এবং কাণ্ড শক্ত হওয়ায় এটি সহজে হেলে পড়ে না। উপযুক্ত পরিবেশে এ জাতের গমে ফলন হবে প্রতি হেক্টরে ৪০০০ থেকে ৫০০০ কেজি।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ১৩৭ কোটি টাকার কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা

সাম্প্রতিক বন্যায় ২৪টি জেলার কৃষকদের মাঝে ১৩৬ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৫৫১ টাকার সার, বীজ ও নগদ সহায়তা দেবে সরকার। ৩ অক্টেবর কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এসব জানান কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

কৃষিমন্ত্রী জানান, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জের ছয় লাখ কৃষককে ১১৭ কোটি টাকার বীজ, ডিএপি ও এমওপি সার এবং এক হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আর নওগাঁ কুড়িগ্রাম, জামালপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, নাটোর নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, শেরপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ১ লাখ ৭৬ হাজার ২০২ জন কৃষক পাবেন ১৯ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৫৫১ টাকার গম, ভুট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম, খেসারি ও বোরো ধান চাষের জন্য বীজ, ডিএপি ও এমওপি সার এবং শাকসবজির বীজ।

ইতোমধ্যে অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং উপকরণও জেলায় জেলায় পৌঁছে গেছে বলে জানান কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। মাঠ পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে যে কমিটি রয়েছে তার তালিকা চূড়ান্ত করে কৃষকদের হাতে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সরকার ৬৪ জেলায় ৫ লাখ ৪১ হাজার ২০১ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে ১০টি ফসলের আবাদ বৃদ্ধির জন্য বীজ, ডিএপি, এমওপি সার সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৫৮ কোটি ৭৫ লাখ ৭৯ হাজার ৩৮৫ টাকার প্রণোদনা প্রদান করেছে।

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ৩ অক্টোবর ২০১৭ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'আকস্মিক বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান কার্যক্রম' বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

কীটনাশককে বিদায়

কীটনাশক ছাড়া ফসল উৎপাদনের কথা যেন চিন্তাই করা যায় না। মানবদেহ ও পরিবেশের জন্য ভয়ংকর ক্ষতিকর কীটনাশককে বিদায় দিল ঝিনাইদহের অনেক কৃষক। ক্ষেতের ক্ষতিকর পোকা দমনের জন্য ফেরোমন ট্র্যাপ ও বিষটোপ ব্যবহার করছেন কৃষক। এছাড়া কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে পার্চিংয়ের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিষমুক্ত শাকসবজি উৎপাদনের ফলে বদলে গেছে অনেক কৃষকের জীবন। কারণ, এতে খরচ তেমন হয় না বললেই চলে। আবার এসব শাকসবজির চাহিদা বেশি থাকায় লাভবানও হচ্ছেন কৃষক।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা ড. খান মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সংবাদ মাধ্যমকে জানান, উপর্যুপরি রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে মাটির আর্দ্রতা নষ্ট হচ্ছে। পানি ধারণক্ষমতা কমছে এবং অনুজৈবিক কার্যাবলি ব্যাহত হচ্ছে। এতে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। সে কারণে জৈব এবং প্রাণিজ সার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বন্যা ও ক্ষরা সহনশীল জাতের বীজ ব্যবহার, লাইন লোগো পদ্ধতি, কীটনাশকের বিকল্প হিসেবে পার্চিংয়ের ব্যবহার করানো হচ্ছে, যেখানে কৃষক সম্পূর্ণ বিনা খরচে ক্ষতিকর পোকা দমন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। **প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা**

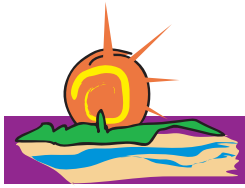

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

ওয়াটার ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৭

বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সেমস গ্লোবালের যৌথ আয়োজনে গত ২৬ থেকে ২৮ অক্টোবর রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে যায় 'ওয়াটার ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৭'। বিশ্বের ৮ দেশের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই প্রদর্শনী ভোক্তা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য একটি

ওয়াটার ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৭

যুগোপযোগী প্লাটফর্মে তৈরি হয়। প্রদর্শনীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগী দপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা বিভাগ, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, যৌথ নদী কমিশন উক্ত প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে এবং নিজেদের প্রকল্প ও কর্মপরিধি তুলে ধরে। তিন দিনব্যাপী এ মেলায় প্রদর্শিত হয়েছে পানির বিশ্বসেরা সব প্রযুক্তি। শিল্প-কারখানা ও বাড়িতে নিরাপদ পানি ব্যবহারে আধুনিক প্রযুক্তি দেখতে উদ্যোক্তাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। উদ্যোক্তারা দেখেন কীভাবে পানি দূষণমুক্ত হচ্ছে। বাসা বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বৈদ্যুতিক দূষণমুক্ত পানি উৎপাদন মেশিনারিজ বাজারজাতসহ কারখানার জন্য ইটিপি প্রযুক্তি প্রদর্শিত হয়। মেলায় একাধিক স্টলে দেখা গেছে, কীভাবে ইটিপি কাজ করছে তা হাতে কলমে শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পানি দূষণ একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সারাবিশ্বে। এই সংকট থেকে মুক্ত হতে পানি ব্যবহারের টেকসই উপায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আয়োজিত হয় একাধিক সেমিনার। এ মেলায় শুধু কারখানার পানি দূষণ নয়, কৃষিতে পানির সমাধান দিতে অংশ নিয়েছে একাধিক প্রতিষ্ঠান। প্রদর্শিত হয়েছে কম মূল্যে পানির পাম্প ও গভীর নলকূপ স্থাপনের আধুনিক প্রযুক্তি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিষ্কার পানি সরবরাহ, লবণাক্তহীন পানি, খাবার পানি, এবং জিরো লিকুইড ডিসচার্জ ইত্যাদি বিষয় প্রদর্শনীতে প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ, রাশিয়া, জাপান, আমেরিকা, ইউক্রেন, সিঙ্গাপুর, চায়না, ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইউএই, সাউথ কোরিয়া, ইতালি, জার্মানি ও তুরস্কের ভোক্তা- উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ, সৌর বিদ্যুৎ জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, নির্মাণ সামগ্রী, নির্মাণকৌশল, যন্ত্রাংশ, সেফটি ও সিকিউরিটি, ওয়েস্ট ওয়াটার টেকনোলজি এবং আবাসন শিল্পের পণ্য ও সেবার বিশাল সমাহার। এতে অংশগ্রহণ করে বিশ্বের ৭৫টি কোম্পানি, ১০০০-এর বেশি পণ্য ও ২০০০ হাজারেরও বেশি পানি বিশেষজ্ঞ।

বিশ্ব বসতি দিবস

আবাসন মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। সবার জন্য বসতি নিশ্চিত করতে প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব বসতি দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'গৃহায়ন নীতিমালা: সাধ্যের আবাস'। **প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন**

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

'মাদার অব হিউমিনিটি' আখ্যা পেলেন শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মাদার অব হিউমিনিটি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে যুক্তরাজ্যের টেলিভিশন *চ্যানেল ফোর*। এছাড়া দুবাইভিত্তিক সংবাদমাধ্যম *খালিজ টাইমস* তাঁকে 'স্টার অব দ্য ইস্ট' (প্রাচ্যের তারকা), ভারতীয় সংবাদমাধ্যম *এশিয়ান এজ* প্রধানমন্ত্রীকে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর হাত থেকে ইহুদিদের রক্ষাকারী রাউল ওয়ালেনবার্গের সঙ্গে তুলনা করেছে। সম্প্রতি সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. শফিউল আলম সংবাদকর্মীদের এসব খবর জানান।

মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের জাতিগতভাবে নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়ে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালাচ্ছে। জীবন ও সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য ইতোমধ্যে ৭ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক সীমারেখা নিয়ে না ভেবে রোহিঙ্গাদের মানব জাতির অংশ হিসেবে ভেবেই আশ্রয় দিয়েছেন। রোহিঙ্গাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বিশ্ববাসীর কাছে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে। এ প্রশংসার অংশ হিসেবেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপরিউক্ত বিশ্লেষণে বিভিন্ন গণমাধ্যমে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৮ নারী উদ্যোক্তাকে পুরস্কৃত করল বিডব্লিউসিসিআই

সফল ৮ নারী উদ্যোক্তাকে 'বিডব্লিউসিসিআই প্রগ্রেসিভ অ্যাওয়ার্ড ২০১৫-২০১৬' শীর্ষক পুরস্কার প্রদান করেছে বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)। সম্প্রতি রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

দেশের ৮ বিভাগ থেকে বিডব্লিউসিসিআই-এর পুরস্কার ও সম্মাননাপ্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

ষষ্ঠবারের মতো আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দেশের ৮টি বিভাগ থেকে একজন করে সফল নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস অপ্রতুল

কর্মক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস, কিন্তু এই সময় একজন গর্ভবতী নারীর জন্য অপ্রতুল। কারণ একটি শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশের ৮০ শতাংশ সাধিত হয় ভ্রূণ থেকে ৮ বছর বয়সের মধ্যে। তাই এই সময়টা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ১৫ অক্টোবর রাজধানীতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে 'কর্মক্ষেত্রে নারীর চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, গর্ভবতী নারীদের প্রতি সহকর্মীদের একটু সহানুভূতিশীল হতে হবে। কারণ এ সময়টা নারী একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায়। এ সময়টাতে যদি আমরা সহানুভূতিশীল না হই, তাহলে নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

নারীর ঘরের কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করবে সরকার

নারীর ঘরের কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন খুবই দরকার। পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে নারীর এ কাজের মূল্যায়নের উদ্যোগ নেবে বর্তমান সরকার। দেশে অমূল্যায়িত সেবামূলক কাজের মূল্যায়ন নেই, যার কারণে জিডিপিতে এর অন্তর্ভুক্তি নেই। সম্প্রতি রাজধানীর দৃক গ্যালারিতে অমূল্যায়িত সেবামূলক কাজের ওপর করা এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এসব কথা বলেন।

'গৃহস্থালি কাজে নারী ও পুরুষের সময়ের ব্যবহার' বিষয়ক অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ-এর করা এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, একজন নারী প্রতিদিন প্রায় ৮ ঘণ্টা গৃহস্থালির সেবামূলক কাজে ব্যয় করেন, যেখানে পুরুষের ব্যয় হয় দেড় ঘণ্টা। কিন্তু নারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার কাজের দাম পান না। সেই সঙ্গে নারীকে 'ডাবল বারডেন অব ওয়ার্ক বা দ্বিগুণ বোঝা' টানতে হয়।

ফতোয়া দিতে পারবেন সৌদি নারীরা

এখন থেকে সৌদি আরবে নারীরাও ফতোয়া জারি করতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির শুরা কাউন্সিল। সম্প্রতি আবর নিউজ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শুরা কাউন্সিলের নারী সদস্যদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও ফতোয়া জারি করতে পারে এ বিষয়টি শুরা কাউন্সিলে বিপুল ভোটে পাস হয়েছে। এর আগে ৪৫ বছর ধরে ফতোয়া জারির বিষয়টি কেবল পুরুষদের জন্য নির্ধারিত ছিল।

সৌদি নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি

প্রথমবারের মতো সৌদি আরবে নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি সংক্রান্ত একটি আদেশ জারি করেছে সৌদি বাদশাহ সালমান। সৌদি প্রেস এজেন্সির একটি প্রতিবেদনে সম্প্রতি এ তথ্য জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় এক প্রতিবেদনে প্রকাশ, বিশ্বে সৌদি আরবই একমাত্র দেশ যেখানে নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি ছিল না। আদেশ অনুযায়ী পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও গাড়ি চালানোর লাইসেন্স দেওয়া হবে। আদেশটি ২০১৮ সালের জুন থেকে কার্যকর হবে। **প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী**

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

মুন্সিগঞ্জের ঐতিহাসিক ইদ্রাকপুর দুর্গ

পূর্বে মুন্সিগঞ্জ ঢাকা জেলার একটি মহকুমা ছিল। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ মুন্সিগঞ্জ জেলায় উন্নীত হয়। মুঘল শাসনামলে বর্তমান মুন্সিগঞ্জ শহর ও শহরতলী এলাকার নাম ছিল ইদ্রাকপুর। বাংলার সুবাদার ও সেনাপতি মীর জুমলা ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা সদরে তদানীন্তন ইছামতি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইদ্রাকপুরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গতি নারায়ণগঞ্জের হাজীগঞ্জ ও সোনাকান্দা দুর্গের চেয়ে আয়তনে কিছুটা ছোটো। দুর্গটি তৎকালীন মগ জলদস্যু ও পর্তুগিজ

মুন্সিগঞ্জের ঐতিহাসিক ইদ্রাকপুর দুর্গ

আক্রমণের হাত থেকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ সমগ্র এলাকাকে রক্ষা করার জন্য নির্মিত হয়। সুরঙ্গ পথে ঢাকার লালবাগ দুর্গের সাথে এই দুর্গের যোগাযোগ ছিল বলে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

ইট নির্মিত চতুর্ভুজাকৃতির এই দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত এবং এর দৈর্ঘ্য ৮৬.৮৭ মিটার ও প্রস্থ ৫৯.৬০ মিটার। দুর্গটির ২টি অংশ। প্রথম অংশ শীর্ষভাগ খিলানকার ফোকর বিশিষ্ট মারলন শোভিত প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত চত্বর। প্রাচীরের ৪ কোণে রয়েছে শীর্ষভাগ মারলন শোভিত ৪টি গোলাকার সন্নিহিত বুরুজ। বুরুজের গায়ে রয়েছে বন্দুকে গুলি চালাবার উপযোগী ফোকর। দুর্গের অপেক্ষাকৃত কম পরিসরের অংশে আছে অনুরূপ প্রাচীর বেষ্টিত একটি গোলাকার বৃহদাকৃতির ড্রাম। বৃহত্তর উন্মুক্ত চত্বর থেকে ড্রামের অংশে পৌঁছার জন্য একটি পথ আছে। দুর্গটির

পূর্বের ব্যাস ৩২.৫ মিটার, উঁচু ৯.১৪ মিটার। এই বেদীতে ওঠার জন্য একটি সিঁড়ি রয়েছে। দুর্গটির অপর বৈশিষ্ট্য হলো ড্রামের পাদদেশে ভূগর্ভস্থ একটি কুঠরি এবং কুঠরিতে অবতরণের জন্য নির্মিত সিঁড়ি। লোকশ্রুতি মতে, এ সিঁড়িটি ছিল গোপন সুরঙ্গ পথের অংশ, যার মধ্য দিয়ে দুর্গে অবস্থানকারীরা কোনো জরুরি অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সরে যেত। এ সিঁড়িটি একটি গোপন ভূগর্ভস্থ কক্ষে অবতরণের পথ এবং সেই কক্ষটি ছিল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুত রাখার গুদামঘর। মূল প্রাচীরের পূর্ব দেয়ালের মাঝামাঝি অংশে ৩৩ মিটার ব্যাসের একটি গোলাকার উঁচু মঞ্চ রয়েছে। দূর থেকে শত্রুর চলাচল পর্যবেক্ষণের জন্য প্রায় প্রতি দুর্গে এই ব্যবস্থা ছিল। দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য মঞ্চকে ঘিরে আর একটি অতিরিক্ত প্রাচীর মূল দেয়ালের সাথে মিলিত হয়েছে। এই দুর্গের প্রধান ফটক উত্তর দিকে। ফটকের উপরের অংশে রয়েছে শীর্ষভাগ খিলানকার ফোকর বিশিষ্ট ও মারলিন শোভিত উঁচু আয়তাকার বুরুজ, যা প্রহরীদের কক্ষ ছিল। দুর্গের ড্রামের উপরিভাগে পরবর্তী সময়ে নির্মিত ভবন বর্তমানে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়। মুঘল স্থাপত্যের একটি অনন্য কীর্তি হিসেবে ইদ্রাকপুর দুর্গটি ১৯০৯ সালে সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষিত হয়। **প্রতিবেদন : লতা খান**

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস

বর্তমান সরকার ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ বছর প্রথমবারের মতো দিবসটি সরকারিভাবে পালিত হয়। জনসাধারণকে সচেতন করতে এ দিনটি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'সাবধানে চালাবো গাড়ি, নিরাপদে ফিরব বাড়ি'। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন।

কার্ড মেশিন স্পর্শ করলেই পরিশোধ বাস ভাড়া

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) যারা বাসে নিয়মিত যাতায়াত করেন তাদের জন্য 'র‍্যাপিড পাস' সেবা চালু করেছে। 'র‍্যাপিড পাস' হলো কার্ডের মাধ্যমে বাস ভাড়া পরিশোধ করা। ১৭ মে থেকে নতুন এই সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কার্ড মেশিনে স্পর্শ করলেই ভাড়া পরিশোধ হয়ে যাবে। সময়মতো কার্ড রিচার্জ করারও ব্যবস্থা রয়েছে। কার্ডে টাকা না থাকলেও একবার ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া যাবে। রিচার্জের পর বকেয়া টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে নেওয়া হবে। এখন পাইলট প্রকল্প হিসেবে বিআরটিসি বাসে এই সেবা চালু হয়েছে। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি. মতিঝিলের লোকাল শাখা, বৈদেশিক বিনিময় শাখা, এলিফ্যান্ট রোড, বনানী, উত্তরা ও সোনারগাঁও- জনপথ শাখা এবং বিআরটিসির উত্তরা হাউস বিল্ডিং, বনানী, শাহাবাগ ও মতিঝিল স্টপেজে র‍্যাপিড পাস কার্ড কেনা ও রিচার্জ করা হয়। এরমধ্যে ২০০ টাকা রিচার্জ হিসেবে কার্ডে জমা থাকবে। ব্যবহারকারীরা একবার সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা ও সর্বনিম্ন ১০০ টাকা রিচার্জ করতে পারবেন। আবার ব্যবহারের সময় কার্ডে পর্যাপ্ত টাকা না থাকলেও একবার কার্ডটি ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে পরবর্তী রিচার্জ থেকে টাকা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করা হয়।

৩০টি সড়কে গাড়ি পার্কিং

যানজট আর গাড়ি পার্কিং নিয়ে ঝামেলা নিত্যদিনের। তাই রাজধানীবাসীকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে ট্রাফিক বিভাগ প্রশস্ত সড়কের এক লেনে করেছে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। এরমধ্যে ট্রাফিক উত্তর বিভাগ গুলশান, উত্তরাসহ ৩০টি জায়গা নির্বাচন করেছে। নির্ধারিত এই সড়কগুলোর এক লেনে করা যাবে গাড়ি পার্কিং। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সঙ্গে সমন্বয় করে নতুন এই উদ্যোগ নিয়েছে উত্তর ট্রাফিক বিভাগ উত্তরার বিভিন্ন সেক্টরের রোড, বিমানবন্দর রোড এবং বনানীতে। গুলশান মহাখালীসহ উত্তর সিটির বিভিন্ন এলাকায় পার্কিং করার জন্য ১২০০ জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে ট্রাফিকের পশ্চিম বিভাগ প্রাথমিকভাবে মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বর থেকে বিআরটিএ কার্যালয় ও খামারবাড়িতে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ২২ অক্টোবর ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০১৭' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন –পিআইডি

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশি-বিদেশি শিশুদের অংশগ্রহণে বিশ্ব শিশু দিবস পালন

শিশুদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শিশুশ্রম বন্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে সারাবিশ্বে প্রতিবছর পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস। ১১ থেকে ১৭ অক্টোবর পালিত হয় শিশু অধিকার সপ্তাহ। ২ অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস। ১৩ অক্টোবর পালিত হয় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস। এবারের ও শিশু অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য – 'শিশু পেলে অধিকার খুলবে নতুন বিশ্বদ্বার'। আবার ১৮ অক্টোবর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ শিশুপুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন। সব মিলিয়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে থাকে শিশুদের সরব উপস্থিতি।

২ অক্টোবর শিশু দিবসে এবারই প্রথম বাংলাদেশসহ ১০টি দেশের শিশুদের অংশগ্রহণে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় শিশু একাডেমি মঞ্চে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রশিক্ষণার্থী শিশুসহ আমেরিকা, ফিলিপাইন, ইন্ডিয়া, স্পেন, তুরস্ক, ইয়েমেন

১৬ অক্টোবর ২০১৭ অনুষ্ঠিত 'শিশু সংসদ ১৪তম বিশেষ অধিবেশন'

ও শ্রীলঙ্কার শিশুর পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় একটি নৃত্যনাট্য 'রক্ত দিয়ে কিনলাম' ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

পথশিশুদের অংশগ্রহণে শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্‌বোধন

সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং সমাবেশের মধ্যে দিয়ে ৭ দিনব্যাপী এবারের শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্‌বোধন করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ১১ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মাঠে এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালিত পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রমের বিভিন্ন শেল্টার হোমের শিশুরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিশুদের জন্য উপযুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে সরকার। শিশুরা তাদের সব অধিকার পাবে। তারা জায়গা পাবে, খাদ্য পাবে, শিক্ষা পাবে।

শিশু সংসদের ১৪তম বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত

এক উৎসবমুখর পরিবেশে জাতীয় শিশু একাডেমির লেকচার থিয়েটার হলে ১৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় 'শিশু সংসদ ১৪তম বিশেষ অধিবেশন'। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি হয়ে আসা শিশুরা অংশগ্রহণ করে। এবারের অধিবেশনের বিষয়– এ বছর দেশের ভয়াবহ বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে 'দুর্যোগ এবং শিশু'। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সহায়তায় এ অধিবেশনের আয়োজন করে 'সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ' ও 'প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ'। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এম.এ. মান্নান।

শিশুদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে মনোযোগী হতে হবে

শিশুদের জন্য সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের আরো মনোযোগী হতে হবে। তাদের বাড়ন্ত শরীরের জন্য প্রচুর পুষ্টির প্রয়োজন– জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেক ১৪ অক্টোবর যশোরের কেশবপুরে, সুফলাকাটি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সুফলাকাটি ও গৌরিঘোনা ইউনিয়নের ছাত্রছাত্রীদের টিফিন বক্স বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, শিশুদের নির্দিষ্ট সময় পর পর ক্ষুধা লাগে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিশুরা পড়ালেখায় মনোযোগী হতে পারে না। তাই টিফিন বক্সে কিছু খাবারসহ শিশুদের স্কুলে পাঠাতে মায়েদের প্রতি আহ্বান জানান। **প্রতিবেদন : নাসিমা খাতুন**

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষায় ৩৬০ স্থাপনা সংরক্ষণের উদ্যোগ

অযত্ন আর অবহেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি লালন করছে এমন ৩৬০টি জায়গা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানগুলো সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ শীর্ষক একটি প্রকল্পের পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রয়েছে এমন স্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ভাস্কর্য, স্মৃতি জাদুঘর, স্মৃতিস্তম্ভ, ম্যুরাল, টেরাকোটা ও লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৭৯ কোটি টাকা। সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে এ অর্থ ব্যয় করা হবে। দেশের ৬৪ জেলার ২৯৪ উপজেলা প্রকল্পটির আওতাভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের মহিমা সমুন্নত হবে। তাছাড়া তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে।

পেনশন প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুবিধার্থে পেনশন প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমত আরা সাদেক ৯ অক্টোবর রাজধানীর ধানমন্ডিতে অবস্থিত অবসর ভবনে বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০১৭-এর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে এখন অল্প খরচে উন্নত চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় ভবিষ্যতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়বে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবীণরা সমাজ ও দেশের জন্য মূল্যবান ও সম্মানিত। তারা

জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০১৭-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি

সারাজীবন সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করেছেন। তাদের পরিশ্রম ও ত্যাগের স্বীকৃতি দিতে হবে।

জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৭

স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, উন্নত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের বিকল্প নেই। মন্ত্রী জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করা স্যানিটেশনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাজেটের শতকরা ১৫ ভাগ ব্যয় করার নির্দেশ দেন।

মন্ত্রী ৮ অক্টোবর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর মিলনায়তনে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১৭'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'পয়ঃবর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উন্নত স্যানিটেশনের সম্ভাবনা' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যথাযথভাবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্যানিটেশনের লক্ষ্য অর্জনের গতি আরো বেগবান হবে'। ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ পাকা স্যানিটারি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কাজ করে যাচ্ছে। মানবসৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ ইতোমধ্যে কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, স্যানিটেশন কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত গঠিত ওয়াটসান কমিটি কার্যকর রয়েছে। দেশের দুর্গম এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নীতকরণ ও লাগসই প্রযুক্তির স্যানিটেশন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি শতভাগ টেকসই স্যানিটেশন নিশ্চিতে জনসচেতনতা ও জনমত তৈরিতে সমকালকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। **প্রতিবেদক : সানজিদা আহমেদ**

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

প্লাস্টিক শিল্প উন্নয়নে রোডম্যাপ-২০৩০

দেশের প্লাস্টিক শিল্প খাত উন্নয়নে রোডম্যাপ-২০৩০ প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (বিপেট)-কে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই রোডম্যাপের আওতায় শতভাগ কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তারা। বর্তমান এ শিল্প খাতে ২৫ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হয়েছে।

৭ অক্টোবর ২০১৭ রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজিএমইএ) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়। সংগঠনটির সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত আয়ের দেশ হলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে প্লাস্টিক শিল্প খাত। প্লাস্টিক সেক্টরে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠবে। অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রনিক্স এবং ফুড সেক্টরে প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহারও বাড়বে। সুতরাং এসব পণ্য সরবাহের জন্য এখন থেকেই উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। তিনি আরো জানান, এ শিল্প উন্নয়নে কমন ফ্যাসিলিটিস সেন্টার করার জন্য বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ২০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া শিল্পোন্নয়ন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে 'বিপেট'-এর স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে 'বিপেট' উন্নয়নে সরকার ১০ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান দিয়েছে।

চামড়া শিল্প রপ্তানিতে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াচ্ছে বাংলাদেশ

২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম ২ মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছে ২৪ কোটি ৮১ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার; যা এই সময়ের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯ দশমিক ৮৩ শতাংশ বেশি। একই সঙ্গে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়ও ৯ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে এ খাতে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ১২৩ কোটি ৪০ হাজার মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ খাতের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩৮ কোটি মার্কিন ডলার। এরমধ্যে জুলাই-আগস্ট মেয়াদে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২২ কোটি ৫৯ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মেয়াদে চামড়ার জুতা রপ্তানিতে আয় হয়েছে ১৩ কোটি ৭ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার; যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩৩ দশমিক ১০ শতাংশ বেশি। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ খাতের রপ্তানি আয় ৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রথম ২ মাসে চামড়ার জুতা রপ্তানিতে আয় হয়েছিল ১২ কোটি ৫ লাখ ৯০ হাজার মার্কিন ডলার।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

তামাকের সারচার্জ দিয়েই হবে তামাক নিয়ন্ত্রণ

'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি ২০১৭' নীতিমালার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। ১৬ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পর সচিবালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম জানান, তামাকজাত পণ্যের ওপর ১ শতাংশ হারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ থাকলেও এই অর্থ খরচের কোনো নীতিমালা ছিল না। এখন এটা নীতিমালার আওতায় এল। নীতিমালা অনুযায়ী, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ হিসেবে পাওয়া অর্থ ১৪টি খাতে খরচ করা হবে। এর মধ্যে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের কার্যক্রম পরিচালনা, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্সসহ অন্যান্য কাজ বাস্তবায়নে সহায়তা, এনবিআরের অধীনে টোবাকো ট্যাক্স সেলের কার্যক্রম পরিচালনা, তামাকের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে প্রচার ও প্রশিক্ষণ এবং তামাকের ব্যবহার, ক্ষয়ক্ষতি ও গবেষণায় এই অর্থ খরচ করা হবে। এছাড়া তামাকবিরোধী আইন নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম, তামাকজনিত অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কর্মরত সংস্থাগুলোর জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা, তামাক চাষ রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং তামাক চাষিদের বিকল্প ফসল চাষে উদ্বুদ্ধ করতেও এই অর্থ ব্যবহার করা যাবে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন, ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ধূমপানমুক্ত হবে। সেটাকে টার্গেট রেখে এই কার্যক্রম চলছে। এর আগে ২০১৪ সালের জুলাইতে আমদানি করা ও দেশে তৈরি তামাকজাত সব ধরনের পণ্যের ওপর এক শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপ করা হয়। এই খাত থেকে বছরে ৩০০ কোটি টাকা আসে। অর্থ ব্যয়ের বিধিমালা তৈরি না হওয়ায় গত তিন অর্থবছরে সারচাজ থেকে পাওয়া ৯০০ কোটি টাকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে জমা রয়েছে। এখন এই অর্থের যথার্থ ব্যবহারের কর্মপরিকল্পনা নিচ্ছে সরকার।

এক বছরে ১০ হাজারেরও বেশি মাদক অপরাধী গ্রেফতার

টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত দেশকে সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত রাখা। তাই মাদক ও সন্ত্রাসকে সম্মিলিতভাবে 'না' বলতে হবে। ২৪ অক্টোবর ঢাকায় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে সীমান্ত কালচারাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাদক ও সন্ত্রাস বিষয়ক এক আলোচনা সভা ও গুণিজন পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মো. মসিউর রহমান রাঙ্গা বলেন, গত ১ বছরে ১০ হাজারেরও বেশি মাদক অপরাধীকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এসময় মাদকাসক্তদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অর্ধশতাধিক নতুন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। **প্রতিবেদন : এনায়েত হোসেন**

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবে *ভুবন মাঝি*

ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হয়েছে নির্মাতা ফাখরুল আরেফিনের চলচ্চিত্র *ভুবন মাঝি*। এবার দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের আরো দুই চলচ্চিত্র

উৎসবে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয়েছে এ ছবিটি। ভারতের অল লাইটস ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয়েছে ছবিটি। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও প্রদর্শিত হবে চলচ্চিত্রটি।

সরকারি অনুদানের ছবি *গহীন বালুচর*

পরিচালক বদরুল আনাম সৌদ নির্মিত সরকারি অনুদানের ছবি *গহীন বালুচর*। এ ছবির অভিনয় শিল্পীরা হলেন– ফজলুর রহমান বাবু, তানভীর, রাসেল, মুন, সুবর্ণা মুস্তাফা, নীলাঞ্জনা নীলা, রুনাখানসহ অনেকে। এ ছবির কাহিনি মূলত– একটা চরের গল্প। চিরন্তন বাংলার গল্প। চর দখল, বেদখল, পরস্পর সংঘাত এবং চরের মানুষের প্রেম ও ভালোবাসা দিয়ে ঘেরা।

৯টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ঢাকার ছবি

বাংলাদেশি তরুণ নির্মাতা হেমন্ত সাদিকের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

অ্যা লেটার টু গড বিশ্বের ৯টি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে মনোনীত হয়েছে। এটি তৈরি হয়েছে মারমা ও বাংলা ভাষায়। ৭ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়ায় তরুণ নির্মাতাদের জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব গ্লোবাল ইয়ুথ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত ২২টি ছবির তালিকায় জায়গা করে নেয় *অ্যা লেটার টু গড*। বিশ্বের প্রায় ২০০ জন তরুণ নির্মাতার চলচ্চিত্র থেকে এ ছবিগুলো নির্বাচিত হয়েছে। এ ছবির কাহিনি মূলত– মা হারা মেয়ে সাংতের গল্পকে ঘিরে। পাহাড়ের পাদদেশে নিঃসঙ্গ একটি বাড়িতে বাবার সঙ্গে থাকে সে। নিজে নৌকা চালিয়ে স্কুলে যায়। এ ছবিটির শুটিং হয়েছে বান্দরবানে। এতে অভিনয় করেছেন– উনি প্রু মারমা ও অং চৌ মং। ৯ নভেম্বর থেকে ইতালির সিত্তাদেল্লায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে জিও ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ও এক্সপোসিনেম। এর মূল আয়োজনে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে এ ছবিটি।

বিশকেকে তানভীর মোকাম্মেলের তিন ছবি

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দ ও কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশকেকে অনুষ্ঠিত পৃথক দুটি চলচ্চিত্র উৎসবে চলচ্চিত্রকার তানভীর মোকাম্মেলের তিনটি ছবি দেখানো হয়। ছবিগুলো হচ্ছে– জীবনঢুলী, লালসালু ও চিত্রা নদীর পারে। ছবি তিনটির মধ্যে লালসালু মুক্তি পায় ২০০১ সালে। এতে অভিনয় করেন– রাইসুল ইসলাম আসাদ, তৌকিক আহমেদ, চাঁদনী। ১৯৯৮ সালের ছবি চিত্রা নদীর পারে। এতে অভিনয় করেন, তৌকির আহমেদ, আফসানা মিমি ও মমতাজউদ্দীন আহমেদ। তানভীর মোকাম্মেলের সর্বশেষ ছবি জীবনঢুলী। এতে অভিনয় করেছেন– শতাব্দী ওয়াদুদ, জ্যোতিকা জ্যোতি, প্রাণ রায়।

প্রতিবেদন : মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বিপিএলে সিলেট

দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জমকালো বিপিএলের পঞ্চম আসর মাঠে গড়িয়েছে সিলেটে। ৪ নভেম্বর ২০১৭ উদ্‌বোধন ম্যাচ বাড়তি আনন্দ যোগ হয়েছে সিলেটের ক্রিকেট প্রেমিদের ঘরের দল সিলেট সিক্সার্স-এর জয় দিয়ে। সব মিলিয়ে বিপিএলকে ঘিরে উৎসবের উচ্ছ্বাসে মেতেছে সিলেট। দেশীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে রঙিন সংস্করণ। উদ্‌বোধন ম্যাচে সিলেট সিক্সার্স-এর জয় দিয়ে বাড়তি আনন্দে আনন্দিত হলো সিলেটের ক্রিকেট প্রেমিরা।

সিলেট সিক্সার্স বনাম গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ঢাকা ডায়নামাইটস-এর ম্যাচ দিয়েই বর্ণাঢ্য উদ্‌বোধন হয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

অনূর্ধ্ব-১৯ এএফসি ফুটবলের বাছাইপর্বে বাংলাদেশ

এএফসি ফুটবলের বাছাইপর্বে বাংলাদেশ কঠিন সমিকরণে পড়েছে। তৃতীয় খেলা বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভেভারিট উজবেকিস্তান এমন একটি কঠিন প্রতিপক্ষ। শক্তি ও সামর্থে বাংলাদেশের ছেলেরা হতাশ নয়। ৬ নভেম্বর মুখোমুখী হচ্ছে দুই দল। বাংলাদেশ দলকে চূড়ান্ত পর্বে উঠতে হলে জয়ের বিকল্প কিছু নেই। কোনো কিছুই চূড়ান্ত করে বলা যাবে না। জিতলে বাংলাদেশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। বাংলাদেশ সেই সম্ভাবনার উজ্জ্বল আলো ছড়াক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৯ বাছাই ফুটবল

উজবেকিস্তান	২	২	০	০	১৬/০	৬
তাজিকিস্তান	২	১	১	০	৬/০	৪
বাংলাদেশ	২	১	১	০	১/০	৪
মালদ্বীপ	৩	০	১	২	২/৯	১
শ্রীলঙ্কা	৩	০	১	২	২/১৮	১

প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজংগী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এসকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে, কিনবে
লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস ।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 38, No. 05, November 2017, Tk. 25.00

প্রকৃতি জানাচ্ছে শীতের আগাম বারতা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা